সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি

[প্রথম পর্যায়]

হরপ্রসাদ মিত্র

গুপ্ত প্রকাশনী
৮ গুপ্ত লেন
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর :
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
'পরিচয় প্রেস'
৮-বি দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রী সুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত
'গুপ্ত প্রকাশনী'
৮ গুপ্ত লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : কোজাগরী পূর্ণিমা, ৯১ রবীন্দ্রাব্দ
ইং অক্টোবর, ১৯৫১

দাম সাড়ে চার টাকা

সূচী—

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

এই পর্যায়ের রচনাকাল ১৯৪৮-৫০। গ্রন্থের নামকরণে স্বর্গত নিত্যকৃষ্ণ বসুর কাছে ঋণ সুস্পষ্ট। ১৯৪৮-৫০ এর মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনাসূত্রে সাহিত্যনিষ্ঠ যে-সব ছাত্রছাত্রীর স্নিগ্ধ সাহচর্যের ফলে এই লেখাগুলি একে একে জমে উঠেছিলো, তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতা রইলো। আমার আচার্য ডক্টর সুকুমার সেন, গুরুস্থানীয় সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ সেন এবং পূজনীয় সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসুর সঙ্গে মৌখিক আলাপ আলোচনায় আমি যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েছি, তা এই রচনাগুলির অঙ্গীভূত হলো। 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীসাগরময় ঘোষ এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল এই গ্রন্থ প্রকাশনায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। প্রবীণ সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের স্নেহদাক্ষিণ্যলব্ধ যে পরিচয়পত্রটি ছাপা হলো তাতে এই গ্রন্থমালার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। ইতি—

হরপ্রসাদ মিত্র

কোজাগরী পূর্ণিমা ৯১ রবীন্দ্রাব্দ
৫৩, বরদা দে ষ্ট্রীট
শ্রীরামপুর

১২৫, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি' বইটি সাহিত্য আলোচনার বই, কিন্তু সে আলোচনার একটা অনন্য-সাধারণ সাহিত্যিক আস্বাদ আছে। নানা বই পড়ে, অনেক রকম চিন্তার মুখোমুখি হয়ে লেখকের মনে যে সব ভাব ও চিন্তা উঠেছে, এবং যা প্রকাশের তাগিদ এসেছে লেখক এই 'ডায়ারি'তে তাই লিখেছেন। সুতরাং বিষয়বস্তুর ঐক্য দিয়ে লেখাগুলি গাঁথা নয়; ওর স্বাদ হচ্ছে সাহিত্যের মজলিশে নানা রকম সাহিত্যিক আলোচনার যে আস্বাদ সেই স্বাদ। মজলিশের একজন মজলিশি বহু বিষয়ে তাঁর মতামত ও চিন্তা জানাচ্ছেন। তার কোনওটা ধার করা নয়, নিজের অনুভূতি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে ঐক্যে ও অনৈক্যে পাঠকের মন সজাগ থাকে। সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক এ 'ডায়ারি'তে মজলিশি আনন্দ পাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধের' আলোচনায় লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের, বিশেষ করে ম্যাথু আর্ণল্ড-এর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার দিকে বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই সৃষ্টির যুগে তার উপর এই সব ইংরেজ লেখকদের ভাব ও চিন্তার কতটা প্রভাব ছিল, তার আলোচনার সময় এসেছে। বাংলা ও ইংরেজি দুই সাহিত্যের সে যুগটা আমাদের কাছে থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সাহিত্য ও চিন্তায় তাঁদের দান আজকের সাহিত্য ও চিন্তায় এমন মিশে গেছে যে তাদের উৎস সম্বন্ধে মনে কৌতূহল জাগে না। সাহিত্যের ইতিহাসের কাজ এই উৎসের সন্ধান দেওয়া।

সেকালের ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের একটু বিশেষ রকম জ্ঞান ও তাদের সম্বন্ধের নিরপেক্ষ আলোচনা এর জন্য প্রয়োজন। লেখকের এই বইটি পড়ে মনে হয় তার উপযোগী মনের মাল-মশলা তাঁর আছে। এ কাজে হাত দিলে তিনি আমাদের সাহিত্যে একটা কাজের মত কাজ সম্ভব করতে পারেন।

আশ্বিন ১৩৪৮।

অতুল চন্দ্র গুপ্ত

লেখক ও পাঠক

'রামের ইতিবৃত্ত যথার্থরূপে জানবার জন্য বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন এবং সমস্ত ঘটনা করতলস্থ আমলকের ন্যায় দেখতে পেলেন। তার-পর তিনি বিচিত্র, পদ ও অর্থযুক্ত সমগ্র রামচরিত রচনা করলেন।'

—বাল্মীকি-রামায়ণ : রাজশেখর বসু

সাহিত্যসৃষ্টির সাফল্য নির্ভর করে দেখবার এই সামর্থ্যের ওপর। মানুষের জীবন নানান্ অভিজ্ঞতায় আকীর্ণ। চেতনার প্রবাহে লক্ষ কোটি তরঙ্গের ওঠা-পড়া। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আমাদের মর্ত্য জীবনের সহচর। তারই অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে ঐক্যের যোগসূত্র। স্রষ্টার অনুভূতিতে সেই যোগটি ধরা পড়ে। বাল্মীকি রামচরিত রচনার পূর্বে তাঁর ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সকল খণ্ডতার অভ্যন্তরগামী একটি ব্যাপক যোগসূত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন।

সাহিত্যবিচারে স্রষ্টার খণ্ড পরিচয়ের প্রতি অতি মনোযোগ অনাবশ্যক। সাহিত্য সমাজতাড়িত সৃষ্টি নাকি সমাজ সাহিত্যিক-নিয়ন্ত্রিত সামগ্রী—এ বিতর্কও অবান্তর। এই দুই মনোভাবের যে কোনো একটির প্রতি অতি-প্রত্যয় অর্ধ সত্যের পোষকতার নামান্তর। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দিয়ে এ কথা আরও সহজে প্রকাশ করা যায় :

'বিজ্ঞান, দর্শন সবই সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে থাকতে পারে এবং ক্রমেই মিশিয়ে যায়। প্রথম গজিয়ে তারা দিনকতক অত্যন্ত খাড়া হয়ে থাকে, তারপরে মানবজীবনের সঙ্গে তারা যতই মিলে যায় ততই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।...এইরূপে সাহিত্য-আকারে যখন সত্য পাই, তখন সে সর্ব্বতোভাবে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়।'

—সাহিত্যের পথে : রবীন্দ্রনাথ

এসব কথা ভারতবর্ষের সাহিত্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরা বারে বারে অনুভব করে বারে বারে প্রকাশ করেছেন। এই সনাতন কথা আজ পুনরায় মনে পড়ছে কেন?

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের শেষ পর্বে বাংলা দেশের সাহিত্য-স্রোতে একটি নতুন বাঁক দেখা দিয়েছে। এই বাঁকের সূচনায় যে সব সাহিত্যরথী ছিলেন অগ্রণী, নজরুল ইসলাম তাঁদেরই অন্যতম। অধুনালুপ্ত 'নবযুগ' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন :

'সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখনও অন্ধ।...বাঁধ দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে।' —যুগবাণী : নজরুল ইসলাম

সাহিত্যের পাঠক লেখকের কাছে জীবনের সার্বিক উপলব্ধির প্রত্যাশী। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম, ভালোবাসা, বিরোধ, সাফল্য, ব্যর্থতা—সব মিলিয়ে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের পূর্ণরূপটি ফুটে ওঠে সার্থক সাহিত্যে। অতীত, অনাগত, বর্তমানের সুবিস্তীর্ণ ব্যাপ্তির মধ্যে সমাসীন সচল আমাদের জীবন। লেখক সেই জীবনের চিত্রকর, পাঠক সেই চিত্রের দর্শক।

সমসাময়িক পৃথিবীর সাহিত্যজিজ্ঞাসায় জীবনসংগ্রামের ক্রমবর্দ্ধমান তিক্ততার সংক্রাম ক্রমশঃ অনিবার্য হয়ে উঠছে। ফলে, সমাজের সাময়িক দাবীও সাহিত্যের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে বলা যায়—'তথ্য' 'সত্য'কে আক্রমণ করছে। এই আক্রমণের ফলে কি হবে বলা শক্ত। নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবীর দীর্ঘজীবী পাঠকসমাজ তা দেখতে পাবেন।

এই হট্টগোলের মনুষ্যসংসারে একজন বাঙালী পাঠক সাহিত্যবিষয়ে দেশগত কালগত ধর্মগত অথবা আচারগত কোনো সাম্প্রদায়িকতায় আত্মসমর্পণ না করে যথাপ্রাপ্ত সাহিত্যপাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন। পাঁজি দেখে শুভদিন খুঁজে এই পাঠ আরম্ভ হয়নি। এই রচনাবলীর লেখক হিসেবে সাহিত্যসমালোচকের মহৎ মর্যাদাও তাঁর অভীপ্সিত নয়। একটি ব্যক্তিগত এষণার দায়িত্বসূত্রে এই লেখাগুলি সুরু হয়েছিল। লিখতে লিখতে ক্রমশঃ দেখা দিল গ্রন্থসম্ভাবনা। এমন সময়ে হঠাৎ চোখে পড়লো D. S. Savage এর লেখা একখানি বই—The Personal Principle (1944)। সেই গ্রন্থের লেখক বলেছেন,

I have no sympathy with either academicism or dilettantism. As I have said, "literature" is not a 'subject". Nor is it an amusement. It is our endeavour to realize the essential nature of our experience of life and to present that realization to ourselves and others.

'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি'-র লেখক সাহিত্য সম্পর্কে এই মনোভাবেরই অংশীদার। বিভিন্ন লেখকের রচনা এবং সাহিত্য সম্পর্কে প্রচলিত বিচিত্র মতামতের পাঠক হিসেবে পাঠককৃত্য সমাপনের জন্যই এই লেখাগুলি

বীরবলের ভাষা

১৯২০-তে প্রকাশিত একটি বাংলা প্রবন্ধের বইয়ে 'বীরবল' সম্পর্কে ছোটো একটি আলোচনায় বলা হয়েছিলো :

শব্দের দেহায়তন যত বাড়বে অর্থের মূল্যও যে তত চড়বে এ ভুল আমাদের প্রমথবাবু ভেঙ্গেছেন। শব্দকল্পদ্রুমের বাইরেও যে চিন্তাশীলতার অবসর আছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

—এবং,

প্রমথবাবুর লেখার সুর খাঁটি বাংলা ভাষার সুর—বলা বাহুল্য, এ-সুর যে কি তা যিনি নিজের কান দিয়ে না বোঝেন তাঁকে কলম দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে—যে-সুর চণ্ডীদাসের, যে-সুর কবিকঙ্কণের—যে-সুর সংস্কৃত-বহুল হলেও ভারতচন্দ্রের—

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল বলে।

এই লাইনগুলোতে আছে;—এ-সুর—সেই সুর।*

প্রথম উক্তিটির অর্থবোধে কোনো সংশয় ঘটবার কথা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিটি দেখে একটু গোলমাল ঠেকে। চণ্ডীদাস—মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্র—তিনজনেই কবি। প্রমথ চৌধুরী যদিচ কয়েকটি 'সনেট' লিখে কবি-খ্যাতি অর্জন করেছেন, তথাপি, তাঁর প্রধান পরিচয় হলো গদ্য লেখক হিসেবে। কবিতার ভাষা এবং গদ্যের ভাষা Free verse-এর আধারে সমীকৃত হয় বটে;—তবে, Free verse বা মুক্তচ্ছন্দে পূর্বোক্তনামাদের মধ্যে একজনও আত্মপ্রকাশ করেন নি। আর, Free verse কাব্যশিল্পের একটি রীতি মাত্র—এবং সাহিত্যিক রীতি মাত্রেই কৃত্রিম; অতএব ও-জিনিষটিও খাঁটি বা অকৃত্রিম নয়।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুসারে দেখা যায় যে, আধুনিক বাংলা ভাষায় মোটামুটি তিনটি শ্রেণী-বিভাগ চলতে পারে: ১। সাধুভাষা, ২। চলিত ভাষা—কলকাতা এবং সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষা—এবং ৩। বিভিন্ন উপভাষা, যেমন, মানভূম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদির আঞ্চলিক ভাষা। এর মধ্যে প্রথম শাখাটি প্রধানতঃ

* সবুজ কথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২০)

কলম ও ছাপাখানার পরিচর্যায় মোটামুটি রামমোহন রায়ের আমল থেকে বেড়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র সে-ভাষার জন্মকালের বহু পূর্বে দেহরক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় শাখাটি সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে বিশ শতকের প্রথম পাদে ('সবুজ পত্রে'র প্রথম আবির্ভাবকাল ১৯১৪)—প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র সে ঘটনাও চোখে দেখবার সুযোগ পান নি। তৃতীয় বিভাগটির উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন,—সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে-অর্থে খাঁটি বাংলা ভাষার উল্লেখ করেছেন সে অর্থ যতোই অস্পষ্ট মনে হোক্ না কেন, তবু এ-কথা অবধারিত সত্য, যে, বাংলা উপভাষাগুলির কথা তিনি ভাবেন নি।

তা'হলে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ-লেখকের ঐ উক্তিটির মানে কি? 'প্রমথ বাবুর লেখার সুর খাঁটি বাংলা ভাষার সুর'—এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দরকার। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী যাঁদের ভাষার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন তাঁদের প্রথম দু'জনের কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তৃতীয় ব্যক্তি ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। প্রমথবাবু তাঁর 'আত্মকথা'-য় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) কৃষ্ণনগরের কথা বলেছেন:

> আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা।…আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল কিন্তু আমার মুখের ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূল পুঁজি, তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে। বাঙ্গলা বই ছেলেবেলায় অনেক পড়েছি, কিন্তু বইয়ের ভাষা আমার কস্মিন কালেও আদর্শ ছিল না।.
>
> ..আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। …সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দু'জনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু'জনেরই লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক্—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়। †

প্রমথ চৌধুরীর ঝোঁক যে বাংলা ভাষার কোন্ রীতির দিকে ছিলো, তা এই 'আত্মকথা' থেকে বোঝা গেল। তিনি কৃষ্ণনগরের মুখের ভাষাকে ভালোবেসেছিলেন—মুখের ভাষা চলতি ভাষা,—তা মুখে মুখে চলতে পারে, বদলাতে পারে,—পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত আত্মবিস্তার ঘটাতে পারে।

† আত্মকথা: পৃঃ ১৭-১৮

রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে :

সাধুভাষা মাত্রা ঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা; চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। *

এই চলতি ভাষাকেই সাধারণতঃ বলা হয় 'কথ্য ভাষা';—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রাকৃত বাংলা'। ভারতচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক 'প্রাকৃত বাংলা'কে অবজ্ঞা করেন নি,—এবং, চণ্ডীদাস-মুকুন্দরামও আপন-আপন কালের এই 'প্রাকৃত বাংলা'র প্রতি উদাসীন ছিলেন না। সুতরাং এঁদের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী-র ভাষাগত সাদৃশ্যের কোনো ভিত্তি যে আদৌ নেই এমন কথা বলা সংগত হবে না। 'সবুজ পত্র' যুগের বই 'সবুজ কথা'-য় এই সাদৃশ্যের ঘোষণাই দেখা যাচ্ছে।

'সবুজ পত্রে' বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের নতুন যে রীতিটির সম্পর্কে আন্দোলন চলেছিল—এবং যে-আন্দোলনের সঙ্গে বীরবলের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত, মোহিতলাল মজুমদার তাঁর একটি প্রবন্ধে সেই নব্য রীতির নাম দিয়েছেন, 'ভাষা-ঘটিত বাস্তববাদ'। 'সবুজ পত্রে' এই ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলনের পূর্বে চলিত ভাষা যে বাংলা সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে একেবারেই প্রবেশ করে নি, তা নয়। ১২৮৬-৮৭ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল: অক্টোবর ১৮৮১) এই রীতিতে লেখা হয়। তা' ছাড়া, মোহিতলালের কথায় –

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ আলোচনা ও ধর্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা, এবং তাহারই লিপিবদ্ধ রূপ বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে ও শব্দবিদ্যা গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল। §

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান পার্থক্য হলো ক্রিয়াপদের চেহারা নিয়ে—তারপর দুই রীতিতে সর্বনামের রূপভেদও প্রশস্ত;—আর তৃতীয় তফাৎটি হলো ভঙ্গিমার। রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে দেখা যাক—

"উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল এইটে থেকেই সর্পবংশ ধ্বংসের উৎপত্তি" এর ক্রিয়া ক'টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধুভাষার ভঙ্গী দিলেই কালী সিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পিঠে মোহিতলাল মজুমদারের নিচের উক্তিটি

* বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮) পৃঃ ৮৬

§ আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার

প্রতিবাদের মত শোনাবে :

বাংলা ভাষার যে ধ্বনি-প্রকৃতির উপর বাংলা-গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাক্যের কোনও অঙ্গে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে সারাদেহ অসুস্থ হয়। সাধু বা সাহিত্যিক বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ও বাক্পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা-বুলি যে ভাবে অন্বিত হইয়াছে তাহাব ধ্বনিরূপ প্রাকৃত নয়—সংস্কৃত। বাংলা পদ্যার যেমন প্রাকৃত-অপভ্রংশের ধ্বনি-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা সংস্কৃত নয়, বাংলা বুলির ধ্বনিও নয়, বরং দূরসম্পর্কে সংস্কৃতের আত্মীয়, তেমনই বাংলা গদ্যের বাক্যচ্ছন্দ কথ্যভাষার ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যে ভাষায় লিখিয়া থাকি—নব্য লেখকেরাও যে ভাষা লিখিয়া থাকেন, তাহার বুলিও প্রধানতঃ সংস্কৃত বা সাধু, তাহার ধ্বনি-প্রকৃতিকে জোর করিয়া কথ্য-ভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায় না।

বীরবলের নিজের রচনায় সাধু বাংলাকে কি-ভাবে 'কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া' সম্ভব হয়েছে, তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে' মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ — তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি, কৌপীন পর্য্যন্ত পেলা দিয়েছিলেন।

—সাহিত্যে খেলা : বীরবলের হালখাতা

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কাণা হয়েছে, তাঁরাই কেবল সত্য মানতে নারাজ হবেন। —বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ ; ঐ

শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত বাপের তাড়নায় বারো বৎসর বয়সে সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী হওয়ার দরুণ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হৃদয়মন যে কতদূর ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। ফলে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন।— শিশু-সাহিত্য ;—ঐ

ওপরের তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যে প্রথমটিতে 'পেলা দিয়েছিলেন'—এই অংশ-টুকু,—দ্বিতীয়টিতে একদিকে 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকার অপপ্রয়োগ' এবং অন্যদিকে 'কাণা হয়েছে'—এই অংশের প্রয়োগ,—আর, তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে 'ইঁচড়ে পেকে' ও 'বৃদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে'—অংশগুলি অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে স্পষ্ট বিভেদ ঘোষণা করেছে,—অর্থাৎ, বেশ বোঝা যায় যে, সনাতন বঙ্কিমী গদ্যের সঙ্গে এই গদ্যের পার্থক্য যে শুধু ক্রিয়াপদ-ঘটিত, তাই নয়,—দুয়ের মধ্যে অন্যতর সুনির্দেশ্য এক ভেদ আছে। আমরা 'বুড়োবয়সে কাঁচতে যাবার' অপচেষ্টায় হেসে থাকি, কিন্তু 'বৃদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে' লিখলে বঙ্কিমী গদ্যের লালনে পুষ্ট মন এবং কান একই সঙ্গে অসন্তুষ্ট হয়। 'সোমপ্রকাশের' মাতব্বর-রা 'শবপোড়া—মড়াদাহের' কটাক্ষপূর্ণ উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির নিন্দা করেছিলেন সদৃশ তাড়নায়। তার হেতু ছিল প্রাক্-বঙ্কিমী গদ্যের সঙ্গে বঙ্কিমী গদ্যের বিরোধে। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই সমসাময়িক লাঞ্ছনায়—

রক্ষণশীল মনোভাবের তাড়নায় নীরব হয়ে যায়নি। সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্বে সনাতনপন্থীরা বিদ্রোহীর শাসনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, এও যেমন সত্য,—নতুন বিদ্রোহী লেখকদল যদি যথার্থ শক্তিমান হন, তাহলে তাঁরাও যে যৌবনসুলভ সাহসে-শক্তিতে-হঠকারিতায়-আত্মপ্রত্যয়ে বৃদ্ধের রক্ষাকবচ অঙ্গে ধারণ করতে পরাঙ্মুখ হবেন,—এও তেমনি সত্য। এ-কালেও তাই হলো। বীরবলের অঙ্গীকারে শক্তি সঞ্চার করলেন চিরযুবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বললেন,—

'আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই সত্তর বছর পূর্বের বাঙালীর মন আর এখনকার মনে তফাৎ বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যে মধ্যেও ভিতরে ভিতরে কাজ করছে। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র।

'বাংলাভাষা পরিচয়' নামক বইখানির অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সমাসবদ্ধ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশি বিদেশি হালকা ভারি সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধুভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে।

চলতি বা চলিত ভাষার আতিথেয়তা যে কতো উদার, তার নমুনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলায় প্রচলিত বিদায়,' 'হয়রান' এবং 'দরদ' এই তিনটি কথার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, আমাদের মাতৃভাষার এই নব্য রীতিতে এই শব্দগুলি অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সে-যুগে ভারতচন্দ্র-ও ভিন্ন এক প্রসঙ্গে অনুরূপ কৈফিয়ৎ দেখিয়ে তাঁর তৎকালীন অভিনব ভাষা ব্যবহার করেছিলেন :—

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥*

ভারতচন্দ্র 'মানসিংহ-পাতশায় কথোপকথন' বর্ণনার জন্য 'যাবনী মিশাল' ভাষাকে 'রসাল' করে তুলেছিলেন! আর এ-কালে যাঁরা বাংলার সাহিত্যিক গদ্যে নতুন মৌখিক রীতির প্রবর্তনা করলেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধা বীরবলের কৈফিয়ৎ হলো :

আমি বাঙ্গালাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

বীরবল এই কারণেই শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রস্তাব স্মরণ করে লিখেছিলেন :

পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে, বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষাতেই হয়।

এই অভিপ্রায় প্রকাশ করে বীরবল্ নিজেই তাঁর উক্তির অন্তর্নিহিত প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন। বাঙ্গালা ভাষা বলতে তিনি কোন্ উপাদানের ওপব জোর দিতে চান? তাঁর নিজের উত্তরটিই দেখা যাক :

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যা' আমরা সকলে জানি, শুনি, বুঝি : যে ভাষায় আমরা ভাবনা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি এবং আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, 'সেই ভাষাই বাঙ্গালা ভাষা? বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙ্গালীর মুখে।

'বীরবল' বাংলার সাহিত্যিক গদ্যে এই নব্যরীতি প্রবর্তনের দায়িত্ব পালন করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে নিজেও 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৫) থেকে তাঁর গদ্য-রচনায় এই রীতি গ্রহণ করলেন। সনাতন-পন্থী মোহিতলাল মজুমদারের খরশান লেখনী একদা এই ব্যাপারে ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলো। তিনি লিখলেন,—

টলষ্টয় শেষ বয়সে আর্টের নূতন আদর্শ স্থাপনার্থে যাহা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধবয়সে ভাষার নবাবিষ্কৃত ভঙ্গির খাতিরে সাহিত্যের সেইরূপ প্রাণদণ্ড করিতে চান।

'ক্ষণিকা'-র (১৯০০) কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এর আগেই যে মৌখিক বাক্-ভঙ্গির মর্যাদা দিয়েছিলেন, সে-কথা স্মরণ করে মোহিতলাল বললেন,

* অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায়

উপলক্ষ্য বা বিষয়-বিশেষে, এই মৌখিক বাক্-ভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে, তা ছাড়া আটপৌরে পোষাকের মত ভাষারও যদি আর একটা ছাঁদ থাকে, মন্দ কি? কিন্তু গদ্যের এই রীতিঃ এমন প্রশস্ত নহে যে তাহাকেই সাহিত্যের রীতি করিতে হইবে—যে রীতি সাহিত্যের রীতি হইয়া আছে, তাহার তুল্য ক্ষমতা ইহার নাই, রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রমাণ হয় নাই যে এই রীতিই শ্রেষ্ঠ, ইহার জন্য পুরাতন রীতি পরিত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে।

মোহিতলাল শুধু এই মন্তব্য দিয়েই তাঁর আলোচনা শেষ করেন নি। তিনি এই ব্যাপারে 'শিল্পী রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-খুসীর স্বাধীনতা' লক্ষ্য করেছেন, এবং প্রশ্ন করেছেন—

খাঁটি সাহিত্যের প্রয়োজনে চলতি ভাষার সহজ প্রাণশক্তির আবশ্যক হইল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আগে হয় নাই কেন?

মোহিতলালের এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৩৪১-এ। তার অনেক আগে 'পদ-চারণে'র কবি প্রমথ চৌধুরী সনাতনীদের এই রোষবিহ্বল প্রশ্নের সম্ভাবনা অনুমান করেই জবাব লিখে গেছেন দশ মাত্রার আটটি চরণে;

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শত গুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম। (১লা নভেম্বর, ১৯১৪)

—এবং অনুরাগী পাঠক জানেন, যে, এই কবিতা লেখার পরে বীরবল তাঁর লেখায় 'অলম্' দেন নি—বরং কালে কালে তাঁর কলম আরো শানিয়ে উঠেছিল। শেষ বয়সে 'আত্মকথা'য় তিনি লিখেছিলেন,

সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং পুরিটানিজ্‌ম্‌কে আমি কোন কালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি।

তাঁর প্রথম বাংলা রচনার ইতিহাস তিনি নিজেই লিখে গেছেন:

ইতিপূর্ব্বে আমি বাঙ্গলা কখনো লিখিনি। আমি যখন এম, এ, পড়ি, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক একটি যুবকের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভায় যোগ দিই এবং সেই সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষগুণই তাতে বর্ত্তমান।

এই প্রবন্ধটিতে লেখক বলেছিলেন,—জয়দেব উঁচুদরের কবি ন'ন। এ মত শুনে চিত্তরঞ্জন দাস অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল বলেছিলেন, 'এতকাল পরে বাঙলায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হল।' 'ভারতী'-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এই প্রবন্ধের অনেকটা ছাঁটাই করে তাঁর পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে মূল রচনার পাণ্ডুলিপিটি ছিল। পরে 'সবুজপত্রে' সেই পাণ্ডুলিপি পুনর্মুদ্রিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাবের সময় তাঁর মতামতের সারবত্তা যেমন একদল মেনেছিলেন, অন্য দল মানেন নি,—তাঁর বুদ্ধিমুখ্য লঘু চালের কথ্য গদ্যরীতি সম্পর্কেও অদ্যাপি তেমনি দুটি দলের বিপরীত মন্তব্য শ্রুতিগোচর হয়। তবে, ইদানীং বিরুদ্ধ দলের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে—একালে তাঁর ভক্ত-সংখ্যাই গরিষ্ঠ।

কিছুকাল আগে কালিদাস রায় মহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাভঙ্গির সঙ্গে বীরবলের রচনাভঙ্গির কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

> বীরবলের রচনা-ভঙ্গির ক্রম আলঙ্কারিক এবং বীরবলের রচনায় অর্থালঙ্কারের সংযত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ আছে—সেজন্য বৈচিত্র্য যথেষ্ট। কেদারবাবুর ভঙ্গিটি কৌতুকমধুর ও শব্দালঙ্কার-ভূয়িষ্ঠ। কিন্তু ক্রমটি আলঙ্কারিক নয়—জীবনের অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রাধান্য দেন এবং ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁহার রচনার ক্রমনির্দেশ করিয়াছে। —সাহিত্যপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড—পৃঃ ১১—১২)

কেদারনাথের সঙ্গে প্রমথনাথের রীতিগত বৈসাদৃশ্যই বেশি, সাদৃশ্য অল্প। তেমনি উনিশ শতকের মধ্যপর্বের লেখক প্যারিচাঁদ মিত্র এবং কালিপ্রসন্ন সিংহের মৌখিক গদ্যরীতির সঙ্গেও বীরবলের মৌখিকতার সাদৃশ্য নেই। 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং হুতোম প্যাচার নকশা'—দুই গ্রন্থই আঞ্চলিক ভাষায় লেখা; বীরবলও কৃষ্ণনগরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের পাটি আঞ্চলিকতায় সাহিত্যোপযোগী খাদ মিশিয়ে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা তিনি অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর আগে কলকাতার আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে নিত্যব্যবহার্য মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক কৌলীন্য দিয়েছিলেন 'য়ুরোপ-প্রবাসী' বিংশতিবর্ষোপদেশিক রবীন্দ্রনাথ—তাঁর বহুবিশ্রুত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' (১৮৮২)।

চিরন্তনী

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যাজ্‌লিট সাহেব তাঁর কাব্যবিষয়ক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'Man is a poetical animal'। কাব্য যে অলসের ভাববিলাসমাত্র নয়,—কাব্যের প্রয়োজনীয়তা যে অনিবার্য, এ-সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। তাই তিনি বলেছিলেন, ইতিহাসের অধ্যায়গুলো মানব-সংসারের নানা ঘটনার শূন্য পাত্র,—আর, কাব্য হলো সেই সব ঘটনার অন্তরঙ্গ স্পন্দন। প্রতিভার যাদুস্পর্শে কবির মুখে যে বাঙ্‌নির্মিতি ঘটে, তারই নাম কাব্য। আর, প্রতিভা হলো অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা'। কাব্য যে অপূর্ব বস্তু,—এ সম্বন্ধে কাব্যরসিকের মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। কিন্তু কাব্যের এই অপূর্বত্ব-গুণটি কাব্যের কোনো বিশেষ উপাদানে আশ্রিত কি না,—তাই নিয়ে পৃথিবীর সাহিত্য-প্রাজ্ঞেরা মাথা ঘামিয়েছেন। কাব্য যে একটি সর্বজনীন ব্যাপার — সুধীজনের আলোচনায় বারে বারে সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় পণ্ডিতেরা শারীরতত্ত্ব থেকে মনস্তত্ত্ব অবধি সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। কারণ, শরীরের মাধ্যমেই জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এবং দেহযন্ত্রলব্ধ নানাবিধ অভিজ্ঞতাই সাহিত্যের উপাদানরূপে গৃহীত হয়। রসশাস্ত্রে রতি, হাস শোক, ক্রোধ প্রভৃতি ন'টি স্থায়িভাবের উল্লেখ ছাড়া আরো অনেকগুলি সঞ্চারীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সব স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের ওপর মানুষমাত্রেরই অধিকার স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু কাব্য রচনায় মানুষমাত্রেই সিদ্ধ নয়। মানুষ মাত্রেই কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো বা ভালোবাসে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতির মার্কা-মারা এই সব অভিজ্ঞতার স্তূপ বাসি ফুল-পাতা-আবর্জনার সঙ্গে প্রতিদিনই স্মৃতির বারমহলে জমে, শুকিয়ে, পচে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দৈনন্দিন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সীমানা অতিক্রম করে চিরন্তন এবং সর্বজনীন আনন্দের ক্ষেত্রে উত্তরণ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এ রকম সিদ্ধি কদাচ ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাই সাহিত্যকে একবার বলেছেন 'দৈববাণী'; আবার অন্যত্র Creative Unity-র এক জায়গায় বলেছেন, 'to detach the individual idea from its enjoyment of everyday facts and to give

its soaring wings the freedom of the universal, that is the function of poetry.'। অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে মানুষকে লোভ জয় করবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপনিষৎ বলেছেন, মা গৃধঃ। যে অনুভূতি কেবল ব্যক্তিমাত্রিক,—ব্যক্তির ভোগেই তা জীর্ণ হয়ে যায়। নির্লিপ্তির প্রসাদে কবি-মানসের সংবেদন ঊর্ধলোকে সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় নেমে শেলী তাই আমাদের সাবধান করে গেছেন, Poetry and the principle of self are the God and Mammon of the world।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। গোষ্ঠীবন্ধন তার স্বভাব। পণ্ডিতেরা বলেছেন গোষ্ঠীকথা থেকে সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজাদের ছিল অক্ষশালা। এই সব অক্ষশালায় পাশাখেলাই যদিচ প্রধান আকর্ষণ ছিল. তবু বীণা, বাঁশী, শয্যা, সুরা এবং অন্যান্য বিবিধ আরামের উপকরণেও অক্ষশালাগুলি পূর্ণ থাকতো এবং প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি চমৎকার এক একটি আড্ডা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কৌটিল্যের সময়েও এরা যে লোপ পায়নি, সংস্কৃত সাহিত্যে তার বহু নজির আছে। অতিথি-আগন্তুকবর্গকে খুশি রাখবার দায়িত্ব বহন করতে হতো অক্ষশালার অধ্যক্ষকে। আমাদের কথকরাও এমনি দায়িত্ব বহন করেছেন। সে যুগে তাঁদের কথকতার গুণেই সর্বসাধারণের কাছে সাহিত্য-পরিবেষণ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতের শ্রোতা ছিলেন সপারিষদ রাজা জনমেজয়, বক্তা ছিলেন—বৈশম্পায়ন। হোমারও জনসমাজের জন্যই তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ, শ্রোতা বা পাঠকের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে অবাধ ভাবে আত্মরতিসাধনে মগ্ন থাকা কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে কোনো যুগেই সম্ভব হয়নি। 'কাব্য দৈববাণী' একথা যাঁরা বলে গেছেন, 'কাব্য মানব সমাজের উদ্দিষ্ট বাণী',—এ কথাও তাঁদেরই। অবশ্য পূর্বোক্ত 'দৈববাণী' শ্রবণ ও গ্রহণ করবার জন্য শ্রোতা বা গ্রহীতার কান-মন যে তৈরি রাখতে হয়, এ কথার উল্লেখও বাহুল্য। স্বাদপরাঙ্মুখ পাঠকের জন্য কাব্যপরিবেষণ নিষিদ্ধ হয়েছে।

তবে নিজেদের রচনায় যথোচিত প্রসাদগুণ থাকা সত্ত্বেও যে সব দুর্ভাগা কবিকে তাঁদের সমসাময়িক পাঠকের আদরে অল্পবিস্তর বঞ্চিত হতে হয়েছে, তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। হুইট্‌ম্যানের অপূর্ব কাব্য সমাদৃত হয়েছিলো তাঁর

পরবর্তী পাঠককুলের আগ্রহে। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন সার্থক রোম্যান্টিক্‌ ব্যাকুলতার সঞ্চার ঘটালেন তখনও রবীন্দ্রসাহিত্যের নিন্দকেরাই বেশি হাততালি পেয়েছিলেন। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের জন্য ক্ষেত্র তৈরি রাখা সত্ত্বেও এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা সর্বসাধারণের নেতৃত্ব করেন। দেশের মনকে প্রাচীন অভ্যস্ত রাস্তার বাইরে টেনে আনবার যোগ্যতা আছে তাঁদেরই। তবে অনেকদিনের দৃঢ়মূল প্রবৃত্তি উৎপাটনের সময়ে ধুলোবালির কিছু কিছু ছিটেফোঁটা থেকেও গা-বাঁচানো চলে না। পূর্বোক্ত অনাদরের হেতু এই ব্যাপারেই নিহিত। নতুন যুগের অভ্যুত্থান সূচনা করে যে-কাব্য,—ভাবে ভাষায়, আঙ্গিকে, কৌশলে প্রাচীন আদর্শের ভিন্ন পথেই তা বিচরণ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সব নতুনত্বের মূলে পাওয়া যায় সনাতন একটি লক্ষ্য—সব কৌশলের পিছনে থাকে চিরন্তন একটি দাবী—মানব-সমাজের কল্যাণ এবং মানব-চিত্তের বিনোদন।

সব দেশে এবং সব কালেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কিছু-না-কিছু নীতি-জ্ঞান প্রচার করেছে। জীবনের সার্থক অভিব্যক্তির পথনির্দেশ করাই এই নীতির লক্ষ্য। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড এই অর্থেই কাব্যকে বলেছেন 'মানবজীবনের ভাষ্য'। আনাতোল ফ্রাঁস বলতেন, একখানি সার্থক বই হলো অদ্ভুত সেই যাদুসৃষ্টি—যেখান থেকে ঝরে পড়ে মানুষের মন পরিবর্তন করবার উপযোগী ভাবনা-বেদনার নির্ঝর। বঙ্কিমচন্দ্র আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'

মানবসভ্যতার প্রগতিতে আস্থা থাকলে সাহিত্যের অপমৃত্যুরও আর আশঙ্কা থাকে না। কারণ, কাব্য বা সাহিত্য হলো কান্তাসম্মিত উপায়ে মানবকল্যাণেরই চিরন্তন পথ নির্দেশনা। অবশ্য, প্রতীচ্যদেশে এর বিপরীত ধারণাও উচ্চারিত হয়েছে। মেকলে বলেছিলেন, সভ্যতার সমৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের উৎসও শুকিয়ে আসছে। কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, এখন এই কথাই বরং স্বীকার্য যে, সভ্যতার প্রসার কাব্যে নব-নব প্রতিফলনে অভিব্যক্ত হবে।

বিশ্বসাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোণ্টন বলেছেন, বিশ্বসভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং সার্থকতম অভিব্যক্তি ঘটেছে বিশ্বসাহিত্যে।

আমাদের মন সংসারের নানা সংস্কারের ক্রীতদাস। নানা মনিবের দেওয়া বিবিধ উর্দিতে তার সাজসজ্জা। সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনার উন্মত্ত আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে যুগে যুগে তাকে এগিয়ে চলতে হয়। তখন তাকে সংসারের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। স্থূল প্রয়োজনের হাজার গোষ্ঠীর বিভাগে নিজেদের আমরা পৃথক করে রাখি, তারপর সাধারণের অলক্ষিতে ঈশান কোণে হঠাৎ যে কখন মেঘ জমে ওঠে,—চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে,—'দুঃখের আঁধার রাত্রি' বারে বারে ভয় দেখিয়ে বিপর্যস্ত করে। দিন যায়, রাত্রি যায়,—মাস যায়, বর্ষ যায়,—কালের স্রোত চলে নিরন্তর! তারপর, সকলের অলক্ষিতেই আবার কখন প্রলয়ের মেঘ কেটে যায়। দিগন্তে নতুন সূর্য ওঠে। এই সব প্রাকৃতিক বৃহৎ ঘটনার পট-ভূমিকায় মানুষের অভ্যাস ও আচরণের বৈষম্য দূর হয়ে গিয়ে তার সনাতন, শাশ্বত স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যে দেখা যায় তারই প্রতিফলন।

> মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী
> নদীর প্রায়
> অভাবিত পথে সহসা কি টানে
> বাঁকিয়া যায়,
> সে তার সহজ গতি,
> সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
> যতই করুক ক্ষতি।

এই 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন'ই হলো মানবচিত্তের স্বধর্ম। কাব্যে মানুষের এই অনাদি, অনন্ত সাধনার ইতিহাস সঞ্চিত আছে। কবিতার ধারা চিরন্তনী—কাব্যবোধ মানুষের সহজবৃত্তি।

দৃষ্টিকোণ, প্রকরণ ও পরিভাষা

ধারাবর্ষণের মধ্যে রেলগাড়ীর চাকায় একটি ছাগলের অপমৃত্যু ঘটতে দেখেছিলাম।

আমরা ট্রেইণে উঠেছিলাম চারজন— চার-ইয়ার' নয়,—পরস্পরের অপরিচিত চারজন যাত্রী। কামরায় পা দেবার আগেই চোখে পড়েছিলো রক্তাক্ত দৃশ্য—ভিজে পাথরের ওপর ছিন্নমুণ্ড ছাগদেহটি তখনো থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিলো।

গাড়ী ছাড়বার পরে সেই একটিমাত্র দৃশ্যের চতুরভিব্যক্তি মর্মগত হলো।

স্থূলোদর, বৃষস্কন্ধ সহযাত্রীটি বললেন: বর্ষার দিনে খিচুড়ির সঙ্গে জমতো ভালো, মশায়!—বলে তিনি তালু এবং জিভের সংঘর্ষে একটি শব্দ করলেন। পরম অতৃপ্তি-তাড়িত একটি অব্যয়!

অবগুণ্ঠিতা যে-মহিলাটি তাঁর অভিভাবকের সঙ্গে নবদ্বীপ দর্শনে বেরিয়েছিলেন, তাঁর অবগুণ্ঠন কুণ্ঠিত হলো। দক্ষিণ করপদ্মে মুখাবরণ সরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর রোষাবিষ্ট বাম দৃষ্টির তিরস্কার নিক্ষেপ করলেন বক্তার অভিমুখে। তাঁর অভিভাবক প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি গলাবন্ধ কোটের অন্তরালে নিজের কণ্ঠলগ্ন তুলসীর মালাটি সমাধিস্থ করে সঙ্গিনীকে বললেন, 'ছোকনের ছাগল—এই নিয়ে পর-পর তিনটে হলো। তবু হুঁশ নেই। রেল-লাইনে চরতে পাঠানো কেন রে বাপু! ছোঃ!'

আরোহীদের মধ্যে একজোড়া মেডিক্যাল ছাত্র ছিলেন। দৃশ্যটি তাঁদের চোখেও পৌঁছেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বললেন: 'Cervical Vertebrae-র চাকলা কি-রকম দেখলে বলো?'

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মুচকে হাসলেন।

এই চারটি মন্তব্যের আলম্বন ছিলো এক এবং অদ্বিতীয়—কিন্তু চারজনের মনে এই একটি দৃশ্যের চার রকম উদ্দীপনা ঘটেছিলো। যিনি খিচুড়ির উল্লেখ করে অব্যয়-ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁর চৈতন্যে ছিলো এই দৃশ্যের অব্যবহিত উদ্দীপন ছাগমাংসের স্বাদের অনুষঙ্গটি';—অপমৃত্যুর সাক্ষী থাকার

ফলে মহিলাটির মনে জেগেছিল অসহায়ের জন্য সহানুভূতি; প্রথম ব্যক্তির ভোজ্যরসাগ্রহের আতিশয্যে তিনি সত্যিই বড়ো আহত হয়েছিলেন;—তাঁর অভিভাবক ভদ্রলোক ছিলেন এই দৃশ্যের তৃতীয় দর্শক; তাঁর মনেও সহানুভূতি জেগেছিলো, কিন্তু মৃতের জন্য ততোটা নয়, যতোটা মৃতের জীবিতাবস্থার মালিকের জন্য;—চতুর্থ সাক্ষী চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রটি দৃষ্ট ঘটনার সঙ্গে করুণ রসের অচ্ছেদ্য যোগ উপেক্ষা করে তাঁর নবার্জিত বিদ্যার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবেই সেই দ্বিখণ্ডিত ছাগদেহের সংবেদনকে আপন বুদ্ধিসাৎ করেছিলেন।

একই বস্তুর এই বিচিত্র রূপ,—একই ঘটনার বিভিন্ন সম্ভাবনা,—একই সংবেদকের অশেষ সংবেদনা,—যতো মত, ততো পথ,—যতো মন ততো ধ্যান,—জগতে এ ব্যাপার নিত্যই চোখে পড়ছে। বিজ্ঞান দর্শন থেকে দ্রষ্টার 'অহং'-কে বাদ দেবার দাবী জানায়। মরমীয়া অধ্যাত্মবাদীরা দর্শনীয়কে অহং-এর প্রসারণ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বলে ভাবতেই চান না। ভাববাদীরা বলেন আদিতে ভাব,—জড়বাদীরা বলেন, 'জড়োঽহং',—কোনো পক্ষ বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—অন্যপক্ষ বলেন, দুই-ই সত্য—বিশিষ্টা-দ্বৈতপন্থী বলেন অচিৎ-ও অজ, চিৎ-ও শাশ্বত—দুই-ই অনাদি.—সমস্ত পরিবর্তনশীল বস্তুর উদ্ভাবন ঘটছে মৌল ঐশ্বরিক চেষ্টায়—'ত্রিবৃত্তিকারণে'ই ঘটছে সৃষ্টি। এ সবই হলো মননশীল মানুষের ভাবনা। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এইরকম ভাবনার বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। দেখা যায় দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা। তা থেকে ঘটে প্রকরণের বিভিন্নতা। Classicism, Romanticism, Idealism, Realism, Naturalism, Hümanism,—Surrealism, Dadaism, Futurism, Cubism, Imagism—ইত্যাদি ইত্যাদি-ism-এর মূলে আছে সর্বস্বীকার্য ঐ একই সত্য,—অর্থাৎ, দৃষ্টিকোণ এবং প্রকরণের বিভেদ। বাংলায় সাহিত্যিক পরিভাষায় এই নামগুলি একে একে চালু হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি নামের বঙ্গানুবাদের ফলে শব্দার্থের মূল ধারণা কোথাও কোথাও ঝাপসা হয়ে পড়েছে। ইংরেজি নামে এসব আমরা যতো সহজে বুঝি,—বাংলা নামে ততো অবলীলায় নয়। যেমন, Idealism-এর প্রতিশব্দ আছে 'ভাববাদ' এবং 'আদর্শবাদ'—

দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথমটি চলে; সাহিত্যের আলোচনায় দ্বিতীয়টি প্রশস্ত। Classicism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'নৈরাত্মপন্থা' চলতে পারে কি? Naturalism-এর বাংলায় 'প্রকৃতিবাদ' অচল,—তবে 'প্রাকৃতবাদ' চলবে কি? সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের দেওয়া 'যথাস্থিতবাদ' নামটি Naturalism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আরও ভালো মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'প্রকৃতিপন্থা' (কবিতা': আশ্বিন, ১৩৫৫)—সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'স্বভাবোক্তি'।—Supernaturalism-এর জন্য তো 'অতিপ্রাকৃতবাদ' চলছে। Humanism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'মানবিকতা'র ব্যবহার দেখা যায়,—কিন্তু Humanitarianism আর Humanism যখন এক বস্তু নয়, তখন বাংলায় নবাগত 'মানবিকতা' শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন দুই অর্থে ব্যবহার করা অসমীচীন। শেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মনুষ্যধর্ম'। ঐ সঙ্গে মনে পড়ে Anthropomorphism—যার লাগসই প্রতিশব্দটি হলো 'নরত্বারোপ-প্রবণতা'। নলিনীকান্ত গুপ্ত Surrealism-এর বাংলা করেছেন 'পরাবাস্তবতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'অতিবাস্তবতা'। Symbolism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চলছে 'প্রতীকবাদ'। ঐ অর্থে 'বিগ্রহ' শব্দটিকে প্রয়োজন মতো বিশেষণে রূপান্তরিত করে তা'থেকে পুনরায় বিশেষ্যে রূপান্তরিত 'বিগ্রহাত্মকতা' কথাটিরও রেওয়াজ আছে। Futurism-এর অনুবাদে কি 'ভবিষ্যবাদ' চলবে? বাংলা 'বাস্তবতা'-র মারফৎ যথেষ্ট মাত্রায় Realism-শব্দটির অর্থবোধ উদ্রিক্ত হতে পারে কি? আমাদের সনাতন দেশী সাহিত্যানুভূতিতে Romanticism এমনই এক অচ্ছেদ্য লক্ষণ ছিলো যে, ঐ ধারণাটি বোঝাবার জন্য কার্যকরীভাবে পৃথক কোনো শব্দের আবশ্যিকতা এখনো আমাদের মাথায় আসেনি—ও-কথাটার অনুবাদ সম্ভব হয়নি—সরাসরি সশরীরে ওকে বাংলা ভাষার নবলোকে প্রবেশ করতে দিতে হয়েছে—আত্মপরের ভেদ-বুদ্ধির চৌকিদারকে সাধ্য মতো ঘুষ দিয়ে কথাটিকে একটু পিটে নিয়ে আমরা বানিয়েছি, 'রোম্যান্টিকতা'। ঐ আদর্শে Dadaism কি হবে 'ডাডাইষ্টিকতা'? সুখের বিষয়, পরিভাষার দেশাত্মবুদ্ধি যাঁদের অতি বেশি সজাগ, তাঁরাও এখনো-ism-এর বাংলায় 'ইষ্টিকতা' চালু করবার প্রস্তাব পেশ করেন নি।

ছোটো বড়ো নানা ism-এর উল্লেখে-ব্যাখ্যানে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্র ক্রমশঃ কণ্টকিত হয়ে উঠছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে এ গুলির বিশ্লেষণ না করে,—

সামগ্রিক ভাবে, কোনো মূল উৎসের শাখা-প্রশাখা হিসেবে এগুলির ক্রম-বিস্তারের ব্যাখ্যান সম্ভব কি না, বিচার্য। সেই লক্ষ্য মনে রেখে কাজে নামলে দেখা যায়, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই-যে এক-একটি দৃষ্টিকোণ, তা নয়। Classicism, Idealism, Romanticism, Realism—এই চারটিকে যদি বলা হয় পৃথক পৃথক চারটি দৃষ্টিকোণ, তা হলে Symbolism, Imagism তো আর 'দৃষ্টিকোণ' নামে অভিহিত হতে পারে না। প্রথমগুলির মাধ্যমে প্রধানতঃ দ্রষ্টার দৃষ্টির প্রকৃতিটিই সূচিত হয়; কিন্তু শেষের দুটিতে বোঝায় সেই দৃষ্টির প্রভাবে নির্বাচিত শিল্প-ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক বা প্রকরণকলা। সুধীন্দ্রনাথ Image-এর বাংলায় 'চিত্রকল্প' কথাটি চালু করেছেন;—তা থেকে, প্রসঙ্গ অনুসারে Imagism হতে পারে চিত্রকল্পনিষ্ঠা', 'চিত্রকল্পিতা'; কিন্তু সে যাই হোক, 'চিত্রকল্প' প্রয়োগের তাগিদ বশতঃ কোনো কোনো লেখকের রচনায় 'চিত্রকল্পনিষ্ঠা' দেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু, 'চিত্রকল্প' প্রয়োগের তাগিদটা আসে যে দৃষ্টিকোণ থেকে, সেটি একদিকে যেমন 'রিয়ালিষ্টিক' হতে পারে,—অন্যদিকে তেমনি 'রোম্যান্টিক' হতেও বাধা নেই। এমনি আর একটি দৃষ্টান্ত হলো Lyricism—বুদ্ধদেব বসু যার প্রতিশব্দ দিয়েছেন, 'গীতলতা'। 'গীতলতা' তো দৃষ্টিকোণ নয়; গীতলতা হলো সাহিত্যিকের মননগত একটি আচরণ। অবিশ্যি আচরণেই দৃষ্টিকোণের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টির ফলেও সমশ্রেণীর প্রকরণ বা আচরণও যে ঘটতে পারে, তার প্রমাণ ক্ল্যাসিক দৃষ্টির গীতিকবিতা এবং রোম্যান্টিক দৃষ্টির গীতিকবিতা। গীতলতা' নামের মাধ্যমে কবির যে আচরণটি বোঝা যায়,—রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণও তার উৎস হতে পারে—আবার, নৈরাত্ম্য ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টির ফলেও তা ঘটতে পারে। এবং এ থেকে আবার এসে পড়ে পরিভাষার প্রসঙ্গ। Classicism-এর ধারণা যদি 'নৈরাত্ম্যপন্থা'য় সুব্যক্ত মনে হয়,—তাহলে Romanticism-এর অনুবাদে 'আত্মমুখিতা' কি অসংগত হবে? রাজশেখর বসু অবিশ্যি Subjective-অর্থে 'আত্মমুখ' কথাটির নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু সেজন্য তো আরো কয়েকটি শব্দ আছে—'আত্মলীন' এবং 'মন্ময়'—আজ-কাল দুটিই তো বেশ চালু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আরও মনে পড়া স্বাভাবিক যে, বুদ্ধদেব বসু Romantic-এর প্রতিশব্দ দিয়েছেন, 'আত্মপন্থী'।

অতএব সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় নিত্যব্যবহৃত ism-বৈচিত্র্যের শ্রেণীবণ্টনের প্রচেষ্টায় নেমে প্রধানতঃ দেখা গেলো দুটি শাখা—কতকগুলি

'ism' হলো স্রষ্টার দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক, অন্যগুলি স্রষ্টার কলাকৌশলের সূচক,—তাঁর আঙ্গিকের অভিধা। এ ছাড়া এমন কিছু পারিভাষিক শব্দ আছে যাদের মূলে কোনোরকম সৃজনী প্রেরণার প্রাধান্য নেই,—সেগুলি হলো সাহিত্য-ক্ষেত্রের নানা আচরণের সূচক। যেমন Plagiarism—কুম্ভিলকতা, Intellec-tualism—মনীষিকতা, Puritanism—অতিনৈতিকতা, Extremism—আত্যন্তিকতা, Journalism—সাংবাদিকতা, Mannerism—মুদ্রাদোষ। আর দুএকটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি আরো সহজবোধ্য হবে। কোনো একজন লেখকের মনের স্বভাবেই যদি আবেগের বাড়াবাড়ি থাকে, তাহলে, তাঁর লেখাতেও দেখা দেবে আবেগাতিরেক। ইংরেজি পরিভাষায় তারই নাম Emotionalism। তেমনি নীতিপ্রীতির আতিশয্যের ফলে অতিনৈতিকতা (Puritanism) ঘটতে পারে, মনের নানাচারিত্বের ফলে লেখা হতে পারে discursive,—আবার, লেখকের ভাবাতিরেকপ্রবণতার ফলে কোনো কোনো লেখায় ভাবালুতাও (Sentimentality) দেখা দিতে পারে!

Classicism, Romanticism, Idealism, Realism,—এগুলিকে কেবলমাত্র মর্জি (attitude) বলা সংগত নয়;—মর্জি তো বটেই,—কিন্তু যার-তার মর্জি নয়, স্রষ্টার মর্জি। Puritanism-ও মর্জি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সৃজনী প্রেরণার সাহচর্য অসম্ভব না হলেও কষ্টকল্প্য। Cubism, Futurism, Surrealism প্রভৃতিকে বলা যায় Realism-এরই বিস্তারণ। Moralism হয়তো Idealism-এর বংশধর,—Idealism-এর সঙ্গে Classicism-এর আত্মীয়তা আছে, কিন্তু দুটির মধ্যে আত্মীয়তার ফল্গুধারা এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে গিয়ে দুটিকে কতকটা স্বতন্ত্র স্বরাজ্য দিয়েছে। তথাপি, ভেদজ্ঞান যাঁদের তীক্ষ্ণ, তাঁরা Idealism-কেও একটি পৃথক দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য দিতে রাজি হবেন না। Idealism অবশ্য বস্তু-নিষ্ঠার বিরোধী, কিন্তু রোম্যান্টিক এবং ক্ল্যাসিক্যাল—দুই পৃথক দৃষ্টিকোণেরই সহগামী। ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে লেখা মহাকাব্যেও Idealism প্রশস্ত, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তা' স্পষ্ট, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের রোম্যান্সে-ও আদর্শবাদ অনুপস্থিত নয়। কিন্তু Classical, Romantic এবং Realistic—এই তিনটি দৃষ্টি-কোণের মধ্যে সেরকম গা ঘেঁষাঘেঁষি নেই। অন্তহীন বৈসাদৃশ্যের মহাসাগরে এরা ভাসছে তিন পৃথক মহাদ্বীপের সীমাস্বাতন্ত্র্য নিয়ে। দিন-রাত্রির বিভেদের

মধ্যেও একটা মিলের সম্ভাবনা আছে। আমাদের কবি গেয়েছেন, 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে'। কিন্তু এরা যে পারাবারে ভাসমান, সে পারাবারে ত্রিবেণীসংগম অসম্ভব,—নৈরাত্মপন্থার সঙ্গে আত্মমুখিতার এবং আত্মমুখিতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার বিভেদ সাহিত্যলোকের মানচিত্রে স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত। তবে কি এরা চিরবিচ্ছিন্ন? সৃষ্টিতে চিরবিচ্ছেদের যন্ত্রণা অন্য সবাই পান,—পান না কেবল, জ্ঞানী। তিনি জানেন, সকল রূপের উৎস হলেন 'অরূপ',—সকল উপাধির আশ্রয় হলেন 'নিরুপাধি'—সকল ব্যক্তের মূলে আছেন 'অব্যক্ত' রসস্বরূপ—একমেবাদ্বিতীয়ম্, শান্তম্, অনন্তম্! তিনি আনন্দস্বরূপ। সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্যাল, রোম্যান্টিক, রিয়ালিষ্টিক—সকল পথের শেষে আছেন অনন্ত রসস্বরূপ।

কিন্তু আপাতত রসোপলব্ধির কথা স্থগিত থাক। বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষার তিনটি শাখা বিভাগের প্রস্তাব পেশ করে এই রচনায় ছেদ টানা যাক। প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে Classicism, Romanticism, Realism,—এই তিনটি মূল দৃষ্টিকোণ,—এবং এদেরই উৎসলীন কিংবা প্রসারণলব্ধ Idealism, Moralism, Cubism, Mysticism প্রভৃতি অন্যান্য ধারণা,—এবং সেই সঙ্গে Platonism, Materialism, Socialism, ইত্যাদি সাহিত্যস্রষ্টার দৃষ্টিনিয়ামক অন্যান্য চেতনাবাচক শব্দগুলি; দ্বিতীয় বিভাগে প্রকার ও প্রকরণ-বাচক শব্দমালা (Signifying types and relating to technique) যেমন, Symbolism, Imagism, Tragedy, Short story ইত্যাদি, এবং সাহিত্যক্ষেত্রের আচরণ-বাচক অন্যান্য শব্দ যেমন Intellectualism, Lyricism প্রভৃতি; তৃতীয় বিভাগে সাহিত্য-পর্যালোচনায় প্রয়োজনীয় অন্যেতর যাবতীয় শব্দ,—যেমন, craft, scene, soliloquy, artifice, cliche ইত্যাদি একত্র তালিকাভুক্ত হলে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার রাস্তা অনেকটা সুগম হবে। অবিশ্যি, তালিকা তৈরির সময়ে এই ত্রিশাখা-বিভাগের চুলচেরা বিচার অনাবশ্যক। আগে অভিধান গড়ে উঠুক;—তারপর শ্রেণীবিভাগ সহজ হবে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক স্তর

Fine Arts-এর বঙ্গানুবাদে 'ললিত কলা' এবং 'সুকুমার শিল্প'—দুটি কথারই প্রচলন আছে। ইংরেজিতে art এর পাশে craft-এর ব্যবহার যেমন স্পষ্ট বিভেদ বোঝায়, বাংলায় 'কলা'-র পশে 'শিল্প' বসিয়ে তা হয় না। কারণ, বাংলায় 'শিল্প' কথাটি উভচর। আর্ট-এর রাজ্যেও ওর ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, craft-এর অর্থেও ওর প্রয়োগ প্রশস্ত। আবার, যুৎসই অন্য কোনো শব্দের সঙ্গ পেলে ঐ উভচর শব্দটি অর্থবোধের এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসতেও কাতর হয় না। একদিকে 'সুকুমার-শিল্প' (fine arts)—অন্য দিকে 'শ্রম-শিল্প' (industries), এই দুই যুগ্ম শব্দের অঙ্গরূপে 'শিল্প'-শব্দের ব্যবহারই তার প্রমাণ।

সুকুমার-শিল্প বা ললিত কলার একটি উপশাখা হলো সাহিত্য। অন্যান্য উপশাখার মধ্যে আছে সংগীত, চিত্ররচনা ইত্যাদি। শৈব তন্ত্রে চৌষট্টি কলার তালিকা আছে। সাহিত্যেরও প্রকারভেদ ঘটতে ঘটতে কালে-কালে চৌষট্টির সীমা ছাড়িয়ে যাবে কি না কে জানে !

সংস্কৃতের 'কাব্য' কথাটি দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য,—চম্পূ, গদ্য, পদ্য, নাটক. নাটিকা, প্রহসন, ভাণ, গীতিকাব্য আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি সকল শাখার সমাহারের সাধারণ নাম। ইংরেজির 'লিটারেচার', সংস্কৃতের 'কাব্য' এবং বাংলার 'সাহিত্য'—অর্থব্যাপ্তির হিসেবে এই তিনটি শব্দই সমমূল্য। আধুনিক বাংলায় 'সাহিত্য' শব্দটি নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি যাবতীয় সাহিত্য-শাখার বাচক।

এ-কালের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত এবং ইংরেজি—উভয় জননীর স্তন্যে পুষ্ট। অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগর-দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের কাল অবধি সংস্কৃত ভাষা ছিলেন মাতা, ইংরেজি ছিলেন বিমাতা। রামমোহন ইংরেজির অনাদর করেন নি,—অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগরের দলও ইংরেজির প্রভূত আদর করেছিলেন,—তারপরে উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজির মধ্য দিয়ে সমগ্র য়ুরোপীয় সংস্কৃতির স্বাদ পেয়ে বাংলায় ইংরেজির প্রতাপ ও প্রভুত্ব বহু সমাদরে বরণ করে নিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধ অনুকরণ নিষেধ করলেন,—মধুসূদন তাঁর পাশ্চাত্ত্য-

আগ্রহের অতিরেকের জন্য বঙ্গভাষা-জননীর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করলেন,—বাঙ্গালী সংস্কৃতির নবজাগরণের লগ্নে তবু ইংরেজির স্থান কায়েমী হয়ে গেল। ইতিহাসের কালানুক্রমে এই সময় থেকেই বাংলার আধুনিক সাহিত্যের সুরু। তবে, আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। মধু-বঙ্কিমের আগে রামমোহন-ঈশ্বর-গুপ্ত থেকে এই পূর্বভূমিকা তৈরি হয়েছে। মধুসূদনের সহকর্মী হেমচন্দ্র, অনুবর্তী নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলাল,—বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক দীনবন্ধু, রমেশ দত্ত, গিরিশ ঘোষ, ইত্যাদি শক্তিমানের আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যে ইংরেজির প্রতাপ উত্তরোত্তর বেড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের যুগে ঈশ্বর গুপ্তের 'খাঁটি বাঙ্গালী' ভাব, মধুসূদনের 'ডাহা ইংরেজী' ভাব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গ-বঙ্গের গঙ্গা-যমুনার ধারা—সমস্ত মিলে মিশে সর্ব সম্প্রদায়ের বিভেদ দূর হয়ে দেখা দিলো একটি মহাপরিব্যাপ্তির প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ ভাষার দিকে হলেন 'প্রাকৃত বাংলার' পক্ষপাতী, কথ্যরীতির ভক্ত,—শব্দচয়নে অতি উদার,—ছন্দ প্রয়োগেও বাংলার নিজস্ব ছড়ার ছন্দকে (স্বরাঘাত প্রধান) তিনি জাতে তুলে দিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কলাকৌশল তাঁর কাছে অস্পৃশ্য রইলো না। আবার আমাদের সনাতন সংস্কৃত সাহিত্যের বেদ-উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব পর্যন্ত কা'কেও তিনি দূরে ফেললেন না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতিভক্তি প্রাকৃত বাংলার পক্ষে তাঁর অনুরাগের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। বৈচিত্র্যই তাঁর আরাধ্য,—ব্যাপ্তিই তাঁর লক্ষ্য। সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্য বরণ করে নিলেন,—সম্প্রদায়ের টান এড়িয়ে তিনি গ্রহণ করলেন সর্বসম্মেলনের আদর্শ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সীমানির্ণয়ে নেমে কেউ ধরেন ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকালের হিসেব, কোনো ঐতিহাসিক বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেন মধুসূদন-বঙ্কিম-দীনবন্ধুর যুগ—কেউবা আরও একটু আগে থেকে—রামমোহন-ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিকতার সূত্রধার মনে করেন। আবার, অতি-আধুনিক যাঁরা, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-কে বলেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ভগীরথ। বাংলা মাসিক পত্রিকার রাজ্যে 'সবুজ পত্র', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'-ই এই আধুনিকতার মহিমান্বিত আদি বাহক। নানা মুনির নানা মতের চক্রে পড়ে সরল মানুষের কৌতূহল উবে যায়। ক্রমশঃ 'আধুনিক'-কথাটাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরের ভাবানুষঙ্গের জালে 'আধুনিকতা'

আর প্রশ্নচিহ্ন পরস্পর জড়িয়ে গিয়ে গড়ে তোলে চিরস্থায়ী এক সংশয়। অথচ 'আধুনিক'-এর ধারণা স্পষ্ট না হলে 'প্রাচীনের' বিশেষত্বও আমাদের বোধগম্য হবে না,—এবং এই দুটির সম্পর্কে সংশয় না কাটলে 'মধ্যযুগের' হিসেবটিও নির্ভুলভাবে বোঝা যাবে না। অতএব, 'আধুনিকতা'র হদিস পাওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।...

...আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি, নিয়ে।

...আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহ'লে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গত ভাবে দেখা। —'আধুনিক কবিতা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অর্থাৎ 'আধুনিকতা' শব্দটি ভাব ও কাল দুটি দিকেরই সূচক। বিশ্বকে তদ্গত ভাবে দেখা যে-আধুনিকতার লক্ষণ, সে-আধুনিকতাও শাশ্বত নয়। সেও এক বিশেষ ঋতুর ফুল। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের 'আধুনিক' পাশ্চাত্ত্য কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছিলেন। মোহিতলাল এই প্রসঙ্গসূত্র-টি এড়িয়ে গিয়ে এটিকে মনে করেছেন শাশ্বত 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞা—রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'নৈর্ব্যক্তিকতা'-তত্ত্বটিকে সার্বভৌম 'আধুনিকতা'র লক্ষণ ধরে নিয়ে তিনি বলেছেন :

এই সংজ্ঞা অনুসারে একমাত্র চীনা কবিতাই টিকিয়া গেল ; উনবিংশ শতাব্দীর তো কথাই নাই—রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতাও বিশুদ্ধ বা শাশ্বতভাবে আধুনিক হইতে পারিল না।

—'বিচিত্র কথা' : মোহিতলাল মজুমদার।

'আধুনিক' মর্জি বলে কোনো স্থিতিশীল সামগ্রী নেই। আধুনিকতারও বিবর্তন আছে। বিগত কয়েক শতকের মধ্যে য়ুরোপীয় মনের আধুনিকতা নতুন নতুন কতো রূপেই যে দেখা দিয়েছে, সেকথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে Michael Roberts-এর লেখা The Modern Mind বই-খানিতে। আমাদের দেশেও সেই রকম হয়েছে। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বপ্রভাবে ভাস্বর ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা ছিলো 'আধুনিক',—উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-কেরী-র সমকালীন 'আধুনিকতা'র সঙ্গে তার বিভেদ অপ্রত্যাশিত নয়। বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই নব্য আধুনিকতারই সাধক ও প্রতিনিধি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা তাকে একটা স্থায়ী গৌরব দিয়ে গেছে। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়া

থেকে বাঙ্গালী মন যে-'আধুনিকতা'র দিকে ঝুঁকেছিল,—রামমোহনের সময় থেকে ধর্ম-সমাজ-ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতি, সকল ক্ষেত্রের সর্বাভিমুখী সক্রিয়তার গুণে বাংলা দেশের প্রাগতরু যেভাবে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল—তারই সাহিত্যিক শতদলের পূর্ণ লাবণ্য দেখা দিলো বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। সাহিত্যে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর পূর্ণ 'আধুনিকতা'র পরাকাষ্ঠা ঘটেছিলো তাঁরই রচনায়। বঙ্কিমের সঙ্গে মধুসূদনের নাম অবিচ্ছেদ্য এই কারণে যে, উনিশ শতকের বাঙ্গালীর যে-'আধুনিক' মনন গদ্যে দেখা দিয়েছিল বঙ্কিমের রচনায়,—পদ্যে তাই ফুটেছিলো মধুসূদনের মেঘনাদবধে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে, বীরাঙ্গনায়। স্পষ্টভাষিতার বিচারে গদ্য অবশ্যই পদ্যের অগ্রগামী। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য-বাহনে তাঁর সমকালীন 'আধুনিকতা'কে যতো স্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত করতে পেরেছেন, মধুসূদনের স্বনির্বাচিত পদ্য-বাহনের পক্ষে ততোদুর সাফল্য ছিলো সাধ্যাতীত। তবু, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে যুগচেতনার অব্যবহিত যোগ—দুই-ই যেমন এক বৃন্তে ফুটেছে, মধুসূদনের কাব্যেও ঠিক তাই ঘটেছে। রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-১৮৮৭), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৫-১৯০০), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২), নবগোপাল মিত্র, শিশির কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকের স্মরণীয় মনীষীদের নানামুখী কর্মপ্রবাহের মধ্যে এই সামান্য লক্ষণটি সুস্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারিচাঁদ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ—ইত্যাদি শক্তিমান সাহিত্যিকরা ছিলেন এই একই পুণ্যব্রতের সাধক। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র কথার মধ্যে 'আধুনিক-

তা'র যে-স্বরটি সাধারণ লক্ষণ হিসেবে ধরা পড়েছে, সেটি হলো আত্মবোধ ও বিশ্বাগ্রহের অবিচ্ছিন্ন অনুশীলন। অবশ্য সেকালে বাংলার চোখে য়ুরোপ-ই ছিলো বিশ্ব-সমগ্রত্বের প্রতীক। য়ুরোপ-ই ছিলো আমাদের উনিশ শতকের যুগদেবপীঠ। তারপর বিশ শতকের বাঙ্গালীর 'আধুনিকতা'-বোধে দুটি নতুন শব্দ ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে,—একটি হলো, 'প্রগতি', অন্যটি 'গণতন্ত্র'। য়ুরোপের প্রতি একালের আধুনিকতা-পরায়ণ বাঙ্গালী সাহিত্যিক শ্রদ্ধাহীন নন, কিন্তু য়ুরোপের প্রগতিসামর্থ্য নিখিল বিশ্বে এখন আর শীর্ষতম নয়। একদিকে এশিয়া ও য়ুরোপ উভয় মহাদেশ-বিধৃত রুশদেশ,—অন্যদিকে মার্কিন মুলুক—সংস্কৃতির মহিমায় এখন এই দুই অঞ্চলই য়ুরোপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে, উনিশ শতকের য়ুরোপ-ভক্ত বাঙ্গালী মানসের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলার বর্তমান সংস্কৃতি এখন দোটানায় নয়, তেটানায় নয়,—একেবারে চৌটানায় পড়েছে। একদিকে হৃতবীর্য য়ুরোপের পূর্ব-বিশ্বাস ও পূর্ব-সামর্থ্যের স্মৃতি এবং বর্তমান শতকের অনির্বাপিত বুদ্ধিনিষ্ঠা, - অন্যদিকে মার্কিন সাহিত্যের নব স্বাস্থ্য,—তৃতীয় দিকে, লৌহ-আবরণী-বেষ্টিত দুর্দম রুশিয়ার গণরহস্য,—আর, চতুর্থ দিকে আমাদের অচিরলব্ধ আত্মকৌলীন্যবোধ—চৌ-দিকের এই চৌটানের মধ্যে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিকতা' ফুটেছে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিনিষ্ঠ, হৃদয়চেতন, সর্বদিদৃক্ষু, অসাম্প্রদায়িক আত্মস্বীকরণে। 'সবুজ পত্র' এই আধুনিকতার প্রথম বার্তাবহ। এই পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ১৩২০-র আশ্বিন মাসে লিখেছিলেন :

> …বঙ্গ-সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে।…প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব-সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করেছে।…বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। …এ যুগের লেখকরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয় :
>
> প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম্ম।
>
> …মানুষ মাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা।

এই 'সবুজ পত্রে'ই কবি সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন : 'যৌবনে দাও রাজ-টীকা'। সম্পাদক বীরবল একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন নব-যৌবনবোধের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচারিত যৌবনধর্মের মধ্যে রক্ত মাংসের বাড়াবাড়ির নিন্দা করে মানবসমাজে যৌবনের নিত্যত্ব স্বীকার করে-

ছিলেন। যৌবনাবস্থার লক্ষণ কি কি? বীরবল লিখেছিলেন:

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষ সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

বীরবল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বঙ্গীয় সমাজে মানসিক যৌবনের নব প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। এই বাসনা প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন:

'মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

উনিশ শতকে ডিরোজিও-র অনুচরদের মধ্যে (তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ Young Bengal-দল) একবার আমাদের মানসিক যৌবন এসেছিলো। এই যৌবনের প্রেরণা দিয়েছিল একদিকে পূর্বগামী ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, অন্যদিকে সমকালীন ইংলণ্ডের বামপন্থী দৃষ্টি ও আচরণ। Young Bengal-এর মুখপত্র 'Enquirer' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' যে জ্ঞানের অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিল, সে জ্ঞানবহ্নি পশ্চিমের আদর্শে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠা দাবী করে, কৃষ্ণমোহন-মধুসূদন প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী বাঙ্গালীকে খ্রীষ্টান করে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্তাকর্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মদ্য ও নিষিদ্ধ ভক্ষ্য বস্তুতে সৌখীন 'প্রগতি'-বাদীদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে—ডিরোজিও-র মৃত্যুর অল্প কাল পরেই সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়েছিল। তবে, সারা শতকের মধ্যে প্রগতি-চিন্তার যে স্রোত বয়ে গেছে, Young Bengal-দল সেই স্রোতেরই একটি বড়ো ঢেউ। রামমোহনের পরে Young Bengal,—তারপরে দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী'-সভা (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী'-বিদ্যালয় (১৮৪০), 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকা-র (১৮৪৩) প্রতিষ্ঠা,—১৮৪৩ এর ৭ই পৌষ ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ, একদিকে রাধাকান্ত দেবের দলের অন্য দিকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুচরদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রগতি-সাধনার মধ্যগা নীতি,—বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার,—১৮৫১-তে British Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা —১৮৪৯ এর 'কালা আইন'-আন্দোলন, ১৮৫৭-র সিপাহী-বিদ্রোহ, ১৮৬০-এ দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ'-প্রকাশ, ১৮৭২-এর হিন্দু মেলা, ১৮৮২-তে বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ধ্বনি, ইলবার্ট-বিলের আন্দোলন, ১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা, প্রায় একই সময়ে বিবেকানন্দের অভ্যুত্থান—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের বিচিত্র প্রগতি-চিন্তার সমগ্রতাটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশ শতকে, সেই ধারাতেই আমাদের মনন এগিয়েছে। নতুনত্ব ঘটেছে এইটুকু যে, আমরা ক্রমশঃ গণচেতন হয়ে উঠেছি। প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ-বিরোধী রাজদ্রোহিতা দিয়েছে গণসান্নিধ্যের সুযোগ,—তারপর পড়েছে নিখিল বিশ্বের সমকালীন ভাবনা-সাধনার প্রভাব। ক্রমশঃ উনিশ শতকের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের' পরিবর্তে আধুনিক স্তরের শেষতম পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে গণনিষ্ঠা। বাংলা সাহিত্যের বিগত দেড়শো বছরে 'আধুনিকতা'র এই হলো আন্তর পরিচয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকার ও প্রকরণের বৈচিত্র্য এই অন্তর্যৌবনেরই দেহকান্তি।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস আর কাশীরামের নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যুগযুগান্তব্যাপী প্রীতির সূত্রে জড়িয়ে আছে। কৃত্তিবাস বাল্মীকিরচিত সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন, আর, কাশীরাম দাস করেছিলেন সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। এই দুই মহাকাব্যের রসধারায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বহুকাল থেকে পুষ্টিলাভ করেছে। অতীতে তো বটেই, এমন কি উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারে যখন বাংলা দেশের সাহিত্য-সভ্যতা,—সব কিছুই নতুন রূপ নিতে আরম্ভ করে, সে সময়েও, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ আমাদের কবি, সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক—সকলেরই মনে প্রভূত প্রেরণা দান করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত্তিবাসের বিশেষ ভক্ত পাঠক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্র-রচনাবলীরও একাধিক স্থলে কৃত্তিবাসের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা গেছে। অর্থাৎ, এদেশের সংস্কৃতির সুদীর্ঘ প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব যে এখানে কতো গভীর, কতো ব্যাপক, কতো বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে অণুমাত্র অসুবিধা হয় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কবির সম্বন্ধে বলেছিলেন,

> "জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
> কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্তির বসতি
> সতত তোমার নাম সুবঙ্গ-ভবনে,……"

মনে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই কবি কতোদিন আগে জীবিত ছিলেন? তাঁর পিতামাতার নাম কি? কোন্ গ্রামে তাঁর বসতি ছিল? তাঁর রচনার প্রকৃতিই বা কি রকম? এতোবড়ো খ্যাতিমান্ কবি যে-গ্রামে বাস করেছেন, যেখানকার ফলে-ফুলে, জলে-হাওয়ায় তাঁর দেহমন গঠিত হয়েছে, সে দেশ অবশ্য তীর্থের সামিল! বাংলাদেশের সেই পবিত্র তীর্থটি কতোদূরে?

রাণাঘাট রেলষ্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে ছায়াচ্ছন্ন ছোটো একটি গ্রাম! বহুকাল পূর্বে এই গ্রাম ছিলো লতায়-পাতায়-ফুলে-ফলে স্নিগ্ধ।

এখানকার অধিবাসীরা জাতিতে ছিলেন মালাকর। কৃত্তিবাস-কবির পূর্ব-পুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। ফুলের সম্পর্ক থেকে এ গ্রামের নাম হয় 'ফুলিয়া'। কৃত্তিবাস বলেছেন,

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী॥

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষদিকে, সম্ভবতঃ ১৩৮০-র কাছাকাছি কোনো সময়ে এই ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, তিনি দীর্ঘজীবী হন নি। সম্ভবতঃ পনেরোর শতকের প্রথম দিকেই তাঁর দেহাবসান হয়। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়, এবং তাঁর আবির্ভাবের বহুপূর্বে কৃত্তিবাসের তিরোভাব ঘটে।

বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, গুরুদক্ষিণা দিয়ে, মনে মনে রাজপণ্ডিত হবার আশা নিয়ে কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের কাছে পাঁচটি শ্লোক উপহার পাঠালেন।

"দ্বারীহস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ॥

কৃত্তিবাস এই যে গৌড়েশ্বরের কথা বলেছেন, ইনি কে? কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, রাজা কংশনারায়ণ।—অন্যেরা বলেছেন, রাজা গণেশ। মনে হয়, এই গণেশ রাজাই ছিলেন কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক। তিনি গৌড়ে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। সে যাই হোক, রাজসভায় কৃত্তিবাস বহু সমাদরে অভ্যর্থিত হলেন। রাজা স্বয়ং তাঁকে রামায়ণ রচনার অনুরোধ জানালেন। এই গৌরবের কথা স্মরণ করে কবি বলেছেন,

চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥

কৃত্তিবাসের এই যে সম্মান,—এ শুধু সেই রাজসভাতেই যে স্বীকৃত হয়েছিল, তা নয়। কৃত্তিবাসের অনেক দিন পরে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনাকালে বলেছেন,

করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস।
যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের আদি অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাস ঠাকুরের এবং সেই সঙ্গে তাঁর জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামের নাম আমাদের সকলেরই বন্দনার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। কবির আত্মপরিচয় থেকে তাঁর কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য—এই দুই বিষয়েই কবির নিজের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর পিতার নাম ছিল বনমালী, মাতার নাম ছিল মেনকা এবং সর্বসমেত ছয় সহোদরের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, এ তথ্যগুলিও জানা যাচ্ছে।

কিন্তু এই সব বিবরণ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের চোখে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এক জটিল সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর এই কাব্যখানির ব্যাপক প্রচারের ফলে কৃত্তিবাসের রচনার নানা অনুলিপি দেশের নানা অঞ্চলে প্রচার লাভ করেছিল। বর্তমান যুগের গবেষকরা এই গ্রন্থের যে-সব পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলির মধ্যে পাঠবৈষম্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে। এই সব বিভিন্ন পুঁথির আলোচনা করে পণ্ডিতরা দেখেছেন যে পূর্ববঙ্গে যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলিতে বৈষ্ণবী ভক্তি প্রচারের বিশেষ কোন চেষ্টা হয়নি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিগুলিতে রাক্ষসদের মুখে রামচন্দ্রের বন্দনাগান আরোপ করা হয়েছে এবং রামচন্দ্রের শরীরে বিষ্ণুর নানা লক্ষণ দেখে রাক্ষসরা ভয়ে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছেন, মনে হয়। বীরবাহু ও রামচন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনাটিই দেখা যাক্ : ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে রামচন্দ্র যখন বীরবাহুর ধনুক খান্ খান্ করে দিলেন, তখন বীরবাহু কি করলেন?

কহিতেছে বীরবাহু যোড় করি হাত
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন॥

বীরবাহু বীর রাক্ষস। শত্রু রামচন্দ্রের অস্ত্রে আহত হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে

এরকম কথা বললেন কি করে? বাল্মীকি তো এমন বর্ণনা দেননি। কৃত্তিবাস নিজের যে বিবরণ লিখে গেছেন, তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি রয়েছে। তাহলে বাল্মীকির রামায়ণে যা নেই, এমন বিষয় তাঁর গ্রন্থে কি সত্যিই লেখা হয়েছিল? ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলিতে মূল রামায়ণ-বহির্ভূত এই জাতীয় বর্ণনা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিগুলিতে এই শ্রেণীর নানা কথা স্থান পেয়েছে। দশাননের আজ্ঞায় তরণী সেন রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে যখন মাতা সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন, সরমা তাঁকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন। সেই নিষেধ শুনে রাক্ষস তরণী সেন বললেন:

তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্য্যাস।
মরিলে রামের হাতে গোলকে নিবাস ।।

পশ্চিম বঙ্গের পুঁথিতে এই সব ব্যাপার চোখে পড়ে। শুধু কি এইটুকু? তরণী সেনের যুদ্ধের সাজ সজ্জা একটু দেখা যাক্:

লক্ষ লক্ষ রাম নাম ধ্বজ পতাকাতে।
লিখিলেক রথে আর আপন অঙ্গেতে ।।

অবশ্য, যুদ্ধে তরণী সেন বিশেষ সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। 'কিন্তু ত্রিভুবন বিজয়ী রামচন্দ্র' যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন সেই যুদ্ধের তাণ্ডব আবহের মধ্যেই তরণী সেন রামচন্দ্রের শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। তরণী বললেন:

"কিছার মিছার গর্ব্ব স্বর্গ নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গে মোক্ষমার্গে যাই ।।"

বলা বাহুল্য, তরণী সেনের ভক্তিময়তার এই বৃত্তান্তও বাল্মীকির রামায়ণে নেই। এই শ্রেণীর আর একটি দৃষ্টান্ত হলো, অঙ্গদের রায়বার। 'রায়বার' কথাটির মানে কি? 'রায়বার' কথাটি এসেছে 'রাজবার্তা' শব্দ থেকে। রাজার কাছে যে স্তুতি পাঠ করা হয়, অথবা কোনো দূত রাজার কাছে যা নিবেদন করেন, তারই নাম 'রায়বার'। রামচন্দ্রের দূত বানর বংশজ অঙ্গদ রাবণের কাছে যে বার্তা নিবেদন করেছিলেন, অঙ্গদের রায়বার-অংশে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণে সেই তথ্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বর্ণনায় রাবণ ও অঙ্গদের বিদ্রূপদক্ষতার সরস দৃষ্টান্তগুলি দেখে পাঠকের মন অবশ্য প্রসন্ন হয়;

কিন্তু, এই 'অঙ্গদের রায়বার' অংশও বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত উপাদান। বাংলা রামায়ণের এ হলো নিজের এলাকা, এবং এই এলাকায়, অর্থাৎ 'অঙ্গদের রায়বার' বর্ণনায় কৃত্তিবাস এবং কবিচন্দ্র নামে দুই পৃথক কবির রচনার যে মিশ্রণ ঘটেছে, পণ্ডিতরা সে কথা স্বীকার করেছেন।

বাংলা রামায়ণের আদি অনুবাদক কৃত্তিবাসের রচনার পাঠবৈচিত্র্য দেখে পণ্ডিতরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটি সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যেতে পারে :—কৃত্তিবাস ছিলেন বাংলার অতি জনপ্রিয় লেখক। ফলে, তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর ভক্ত কবিদের অনেক রচনাংশ, অনেক কল্পনা, অনেক ভক্তির কথা এবং হাস্যপরিহাসের দৃশ্য বহুকাল ধরে মিশ্রিত হয়ে এসেছে। তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি, বাল্মীকি রামায়ণের পরিবেশটি তিনি নিজে যে তাঁর অনুবাদে সর্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তা ঠিক বলা যায় না। বাংলা-দেশের সংস্কার, আচার এবং বিশেষ প্রবণতাগুলির প্রভাব কবি নিজেই কিছু কিছু তাঁর অনুবাদে এনে ফেলেছিলেন। তারপর আরও নানা কবির রচনার মিশ্রণে আমাদের বর্তমান যুগে কৃত্তিবাসের মূল অনুবাদ বহুধা বিকৃত রূপে আমাদের দশে প্রচলিত রয়েছে।

কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের মধ্যে আজ আর অবিমিশ্র কৃত্তিবাসী কাব্য-সৌরভটি পৃথক করে পাওয়া যায় না। বাংলার কৃত্তিবাস আজ বাংলার একাধিক শতাব্দীব্যাপী জীবনের বিচিত্র কথা-উপকথার একটি প্রীতিকর প্রতীক রূপেই বন্দিত !

আধুনিক বাংলা গদ্য

সংস্কৃতে যাকে বলে গৌড়ী রীতি, তার বিশেষত্ব হ'লো সমাসবহুলত্বে, আর, বৈদর্ভী রীতি ঠিক তার উল্টো,—সে রীতি সারল্য ও দুর্বোধ্যতার প্রতি উদাসীন নয়। বাংলা সাহিত্যের গদ্যধারার কালানুক্রমিক আলোচনায় নামলে উনিশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের এই মধ্য দশক পর্যন্ত, দেড়শো বছরের গদ্যের ইতিহাসে বারে বারে এই দুই রীতিগত প্রকৃতির অভিমুখে বাংলা গদ্যের নিয়মিত দোলন লক্ষ্য করা যায়। কালপ্রবাহের এক

পর্বে গদ্য সারল্যের দিকে ঝুঁকেছে,—অন্য পর্বে গাম্ভীর্য ও দুর্বোধ্যতার দিকে ঠেলা খেয়ে এগিয়ে গেছে। এ ঘটনা একবার ঘটেই থেমে যায়নি—ঘটেছে বারে বারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং প্যারীচাঁদ মিত্র,—তারপর, হাল আমলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবান লেখক—এঁদের গদ্য-রচনার বিশ্লেষণ করে দেখলে ব্যাপারটি বোধগম্য হয়। রবীন্দ্রনাথ,— তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র,—রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী—এঁরা তিনজনেই আপন আপন কালের পূর্বকথিত গদ্য-প্রকৃতির দুই ঝোঁকের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে, দুই প্রবণতার সমন্বয় ঘটিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস নানা ঘটনায় সমাকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল'-পুরস্কার প্রাপ্তি, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরীর মতো শক্তিমান কবি ও গদ্য লেখকদের উদয়াস্ত,—'সবুজ পত্র', 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'শনিবারের চিঠি' 'কবিতা' ইত্যাদি পত্রিকাদির প্রতাপ—প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার তারাশঙ্কর, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ, বনফুল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি গল্প-উপন্যাস-স্রষ্টা, যতীন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার দত্ত, বিষ্ণু দে, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পূর্বোক্তনামাদের মধ্যে কয়েকজন, ও তাঁরা ছাড়া সমসাময়িক বহু শক্তিমান কবির রচনা,—পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী, রাজশেখর বসু, গোপাল হালদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, ৺চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নীহাররঞ্জন রায়, সুধীরকুমার দাসগুপ্ত, নবেন্দু বসু প্রভৃতি লেখকদের প্রচেষ্টা—কিশোরদের সাহিত্য পরিবেশনে সুকুমার রায়ের অনন্য সিদ্ধি এবং আরো বহু বিচিত্র সার্থকতায় বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর বিশেষ সমৃদ্ধির কাল বলেই গণ্য। এ ছাড়া, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৺বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি অসংখ্য শক্তিমানের নাম বিনা চেষ্টায় মনে পড়া স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই পঞ্চাশ বছরের বিচিত্র কীর্তির সর্ব বিভাগের কেবল উল্লেখ করতে হলেও পুঁথির কলেবর অতিকায় হয়ে উঠবে। সে রকম প্রয়াস

বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। আপাততঃ, একালের বাংলা গদ্যের বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাক,—অর্থাৎ বিশ শতকের বাংলা গদ্যের প্রকৃতি কোন্ দিকে ঝুঁকেছে, সেই তথ্যটিই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। সেজন্য একটু আগেকার স্তর থেকে এগিয়ে আধুনিক স্তরে পা দেওয়া দরকার। 'আধুনিক' কথাটি এখানে কেবল কালমিতির উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা গেল। 'আধুনিকতা' এবং 'চিরন্তনতা' নিয়ে রসোপলব্ধির কোনো নিগূঢ় প্রকৃতিভেদ সম্পর্কে কূটবিশ্লেষণ এই রচনার প্রতিপাদ্য নয়।

বাংলা গদ্যের এই দেড়শো বছরের ইতিহাস আলোচন করলে তার উৎস থেকে পরিণতির আধুনিকতম স্তরে এসে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই গদ্য উনিশ শতকে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে রামমোহন-বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কলমে লালিত হযে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে প্রমথ চৌধুরীর হস্তক্ষেপে আর একবার উল্লেখযোগ্য একটি পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বাংলা গদ্যের এই নতুনতরো পরীক্ষার ব্যবস্থা সুরু হয। প্রমথ চৌধুরীর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'বীরবল' ছদ্মনামে। বীরবল ছিলেন সম্রাট আকবরের সভাসদ—রসিক এবং পণ্ডিত,—ইতিহাস-প্রখ্যাত ব্যক্তি। বাংলা গদ্যের নবযুগস্রষ্টা, বিশ শতকের বাঙ্গালী 'বীরবল'ও তাঁর রসিকতায় এবং পাণ্ডিত্যে বাঙ্গালী পাঠককে চমৎকৃত করলেন।

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গদ্য রচনায় বাংলা ক্রিয়াপদের যে সাধুরূপের প্রচলন চলে এসেছে, সর্বনামের যে চেহারা দেখা গেছে, শব্দচয়নে যে সংস্কৃতানুসারিতা ধরা পড়েছে,—'সবুজ পত্রে' সে-সব রীতি গেল বদলে। কলকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত লোক মৌখিক আলাপে যে-রকম ভাষা ব্যবহার করেন, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সেই রীতির আদর্শেই বাংলার গদ্যকে দিলেন নতুন মূর্তি। কলকাতার সমাজের ভাষায় কৃষ্ণনাগরিক বাক্‌চাতুর্যের প্রক্রিয়ায় নানান শব্দ মিশিয়ে নতুন যে গদ্য তৈরি হ'ল, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তার নাম দিয়েছেন 'বীরবলী রীতি'। এ রীতি গৌড়ী নয়,—বরং বৈদর্ভী বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন রীতি তাঁর কলমেও বরণ করে নিলেন। ফলে এ-

রীতি ঐ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার সমর্থনে আভিজাত্য এবং কৌলীন্য লাভ করলো। একশো বছরের বাংলা গদ্যের ধারায় এই ভাবেই একালের আধুনিকতার সূত্রপাত হলো। গদ্যের পেষাকী চেহারা উঠে গিয়ে বেশ একটি সহজ সুন্দর আটপৌরে মহিমার বিকাশ ঘটলো। 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হবার কয়েক বছর আগেই প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন,

যতদূর পারা যায় যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই, লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

এই রচনাটিরই শেষদিকে বীরবল আরও বলেছিলেন—

ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটা নিতান্ত নাহলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষায় ভিতর থেকে খাপ্ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে ধার কিম্বা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

এই আদর্শ নিয়ে বীরবল বাংলা গদ্যের আসরে নামলেন। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়ে এই আদর্শটি পরবর্তী বাংলা গদ্যের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে উঠলো। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষার রূপ বদলাতে উদ্যত হন নি। তিনি সাধু ভাষাতেই লিখে গেছেন; সে ভাষা সরল এবং মধুর।

বীরবলের এই নতুন রীতি স্থাপনের পরে আমাদের শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, অর্থাৎ ১৯৩০—৪০ এর মধ্যে বাংলা গদ্যে আর একটি নতুন ঢেউ উঠেছিল। একদিকে 'সবুজপত্র' এবং অন্য দিকে ১৯৩০-৪০-এর এই আন্দোলন—এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনাটি হলো 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ। 'সবুজপত্র' ১৩২১-এ এবং 'কল্লোল' ১৩৩০-এ প্রথম আত্মপ্রকাশ

ধারা,—করে। তার আগে ছিলো 'হিতবাদী' এবং 'সাধনা' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) 'সাধনা'র আগে 'ভারতী'। কিন্তু 'সবুজপত্র' বাংলা গদ্যের যে বিচিত্র সংস্কার ঘটালো, পূর্ববর্তী এই কাগজগুলির মধ্য দিয়ে তেমন বিপুল কোনো পরিবর্তন আর ঘটেনি। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রথম ছাপা হয়েছিল 'ভারতী'তে; 'সাধনা'য় ছাপা হয়েছিল 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' (১৮৯১-৯২)। এই দুই রচনাই চলিত ভাষায় লেখা, প্রথমটির সঙ্গে শেষেরটির ব্যবধান প্রায় বারো বছরের। 'সবুজপত্রে' বাংলা দেশের তৎকালীন লেখকরা বাংলা গদ্যের রীতিও বদলে দিলেন, তাতে নতুন বিষয়েরও সন্নিবেশ ঘটালেন। 'কল্লোলের' লেখকদের বক্তব্য বিষয়টি ছিলো অভিনব, কিন্তু তাঁরা বীরবলী-গদ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সুতরাং বিষয়ের দিক থেকে নানা কারণে 'কল্লোলের' গদ্যরচনাবলী স্মরণীয় হয়ে থাকলেও লিখনরীতির বিচারে সেগুলি 'সবুজপত্র'-যুগেরই অনুসাধনার দৃষ্টান্ত। তারপর, গদ্যের মোড় ফিরেছিল ১৯৩০-৪০এর মধ্যে,—যখন বাংলা ১৩৩৮ সালে 'সবুজপত্রে'র অপেক্ষাকৃত উৎসাহী শিষ্যেরা 'পরিচয়' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই কাগজটি আগে ছিল ত্রৈমাসিক, পরে মাসিকে পরিণত হয়। 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর লেখকদের হাতে বাংলা গদ্য ক্রিয়াপদের-সর্বনামের চলিত রূপগুলি বর্জন না করেও বিশেষ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠলো। এঁরা অনেক অপরিচিত শব্দ আমদানি করলেন। ইংরেজি 'ইডিয়ম্'-এর বঙ্গানুবাদ করে, সংস্কৃত পুঁথিপত্র ঘেঁটে নানা নতুন কথা বানিয়ে বাংলা সাহিত্যের রাজপথে এঁরা চালু করে দিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' থেকে এই শ্রেণীর গদ্যের একটু নমুনা দেওয়া হলো :—

'বর্ত্তমানের বুদ্ধি বৈনাশিক ; তার উল্লেখনী মানুষী কীর্ত্তিস্তম্ভের আপতিক ভিত্তিকে এমনি নিষ্ঠুর অন্বেষণে আমাদের জ্ঞানগোচরে এনেছে যে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহে আমরা আজে স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ। অতএব কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয় ; সে-গাছ পর্ব্বতজাত রডডেনড্রনের মতো তনুবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত ;··· [কাব্যের মুক্তি]

'অনীহা', 'বৈহাসিকতা', 'কলাকৈবল্য', 'হার্দ্দ্য', 'ঝিলমের বন্দারু স্রোত', 'শ্লেষ্মাপ্রধান চারিত্র্য', নির্ব্যাজ', 'সার্ব্বভৌম বিপ্রকর্ষ' ইত্যাদি শব্দভারে

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য বৈশিষ্ট্যময়। তার মানে এ নয় যে, তাঁর রচনার ভার শুধু শব্দগত;—সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি-সংস্কৃত-ফরাসী ইত্যাদি নানা সাহিত্যে বিচরণের ফলে তাঁর মননগত যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তাঁর লেখায় তারই প্রকাশ ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি বচনের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করেছেন, যেমন—করকৌশলপ্রদর্শন (sleight of hand.), ধাতুসঙ্কর (alloy), তনুবাত শিখর (airy peak ?), নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন (emotion recollected in tranquillity), নঙর্থক ক্ষমতা (negative capability) ইত্যাদি। আবার কখনো বা বাংলায় অল্প-প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার তাঁর গদ্যরীতিকে দিয়েছে গাম্ভীর্যময় এক অভিনবত্ব। 'স্বগত' বইখানির সূচনা-য় তিনি লিখেছেন,

> বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্ব্বোধ্য ব'লে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ;

এই ঈষৎ খেদ-ব্যঙ্গদিগ্ধ বিনয়প্রতিম উক্তিটি, প্রকৃতপক্ষে, শক্তিমানের জয়-ঘোষণা মাত্র। ১৩৪৫-এ 'স্বগত'-প্রকাশকালে সুধীন্দ্রনাথ যখন এ-কথা লিখেছিলেন, তখন, তাঁর গদ্যরীতি ছিল ক্ষুদ্র এক ভক্ত-গোষ্ঠীর তারিফ-লালিত এবং প্রবীণ লেখক-পাঠক-সম্প্রদায়ের কৌতুকপ্রদ সামগ্রী বিশেষ। কিন্তু বর্তমানে এই গদ্যরীতি কতো-যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আধুনিকতম বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিকে চোখ ফেরালেই বোঝা যাবে। এখানে বহুশ্রুত ফরাসী সদুক্তিটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই—সকলেই জানেন যে, style হলো স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের অননুকরণীয় মৌলিকতা ; প্রত্যেক শক্তিমান লেখকেরই নিজস্ব এক-একটি style থাকে। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের অনুচর-সংখ্যা বেশি নয়,—সে-কথা সত্য ; 'সবুজপত্রের' গদ্য অর্থাৎ বীরবলী গদ্য যেমন সহজ সংক্রামক-রূপে বাংলা দেশের নানা লেখকের রচনায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সুধীন্দ্রনাথের এই তথাকথিত কঠিন গদ্য ঠিক সেরকম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি, তাও সত্য ;—তথাচ, এই কাঠিন্যের সাধনা হাল আমলের অনেক লেখকের রচনাতেই অল্প-বিস্তর দেখা যে না-দিয়েছে, তাও নয়।

বিশুদ্ধ বঙ্কিমী গদ্যের দৃষ্টান্ত এ-কালের সৃজ্যমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরল হয়ে এসেছে বটে,—তবে, এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। গদ্য-রচনায় মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ উত্তরসাধক। মোহিতলালের গদ্যভঙ্গির একটু নমুনা দেখা যাক :

'কিন্তু 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' যাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ একালে যেমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এই অবস্থা আর কখনও হয়তো হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা মানুষের স্মরণাতীত, সে মন্বন্তর প্রাগৈতিহাসিক। ইহা সাধারণ কালধর্ম্ম নয়—ইহা অকাল ; মহাকালরূপী মহোরগ যেন নিজ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিজের পুচ্ছ দংশন করিতেছে !' ['শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকান্দ']

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল, সুসংযত, সুশ্রব্য এবং সর্বসমর্থ এক রীতি সৃষ্টি করে গেছেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ, ভূদেব প্রভৃতি লেখক বাংলা গদ্যের শব্দবিন্যাসে, বাক্য-গঠনে, ছেদ-যতি-অনুচ্ছেদের বিন্যাসে-বন্ধনে ক্রমবর্ধমান যে প্রযত্নের যোগ ঘটিয়েছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই ধারার সর্ববৈচিত্র্যের সুসমন্বয়কারী লেখক। বঙ্কিমী রীতির প্রধান ভিত্তি ছিলো তাঁর শব্দচেতনা,—ভারসাম্যবোধ এবং অলংকরণ-বৈশিষ্ট্য ;—কিন্তু গতানুগতিক অলংকরণ নয়,—গদ্যের গতি নির্বিঘ্ন রেখে, কথাবস্তুর মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চার করে শব্দে-অর্থে গদ্যকে তিনি অলংকৃত করে তুলেছিলেন। তাঁর গদ্যে দীর্ঘ সমাসের দৃষ্টান্ত অল্প নয়, ইংরেজি এবং সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির অনুকরণের উদাহরণও তাতে বড় কম পাওয়া যায় না—কিন্তু যে-বিশেষত্ব একমাত্র বঙ্কিমের গদ্যেই দেখা যায়, সে হলো ধ্বনিবৈশিষ্ট্য এবং অলংকরণপটুতা। একাধারে অলংকৃত এবং ধ্বনিমান এই সমাস-গম্ভীর, গদ্যের প্রতি নিষ্ঠার জন্য গদ্যলেখক মোহিতলালকে বলা যায় এ-কালের বঙ্কিমচন্দ্র।

আধুনিক বাংলা গদ্যের জরীপ করতে বসলে প্রধানতম যে ধারাটি প্রচুরতম ক্ষেত্রে চোখে পড়ে, সেটি হলো প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তনার সৃষ্ট 'বীরবলী' রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র যে-গদ্যের উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর পূর্ববর্তী রীতির তুলনায় সে-গদ্যও ছিল তৎকালীন মৌখিক ভাষার নিকটবর্তী। বীরবলী গদ্যের পরে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য ক্রিয়াপদের, সবনামের এবং ভঙ্গির মৌখিক প্রকৃতি মেনে নিয়েও এক বিপরীত আন্দোলন তুলেছিল। বীরবলী-গদ্যের ছিল সহজ এক প্রবাহধর্ম ;

তার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত শব্দতক্ষণ-কলার যোগে উত্তরসাধকদের লেখনী আরও বলিষ্ঠ, আরও মসৃণ, আরও বিচিত্রগামী হয়ে উঠল।

পঁচিশ বছর আগে যেমন ছিল, তার তুলনায়, হাল আমলে—বাংলা গদ্য-লেখকদের নৈপুণ্যের মান অনেকটা বেড়ে গেছে। গণতন্ত্রের যুগে লেখকদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে,—অন্ততঃ গদ্যের ক্ষেত্রে, লেখার গুণ বা স্বাদ সে-অনুপাতে কমে নি!—বরং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য উত্তরোত্তর ক্ষিপ্র ও সুঠাম হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক অন্যান্য অনেক রচনার মধ্যে জ্যোতির্ময় রায়ের 'দৃষ্টিকোণ' (১৩৪৮) ও 'অন্যান্য' (১৩৫১), যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' (১৩৫৩), ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' (১৩৫৬) এবং ইন্দ্রজিৎ-রচিত 'ইন্দ্রজিতের খাতা' (১৩৫৬) বাংলা সাহিত্যের সদ্যস্তন গদ্য-রচয়িতাদের সার্থক কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। এঁদের গদ্যরীতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এঁরা বীরবলী ধারারই প্রত্যক্ষ বাহক—তবে, নতুন নতুন শব্দতক্ষণের প্রবণতায় এঁরা সুধীন্দ্রনাথেরই অনুচর। সুধীন্দ্রনাথ স্বভাব-গম্ভীর ব্যক্তি—কিন্তু বীরবলের নীরসতম গাম্ভীর্যও নির্হাস নয়। পূর্বোক্ত চারজন লেখকেরই পক্ষপাত যে বীরবলী-প্রকৃতির অভিমুখী, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কথ্যরীতির কাঠামো বজায় রেখে প্রধানত হালকা কথাকে যুক্তিসূত্রে সুসংবদ্ধভাবে বেঁধে প্রবহমান করে তোলাতেই এঁদের কৃতিত্ব। 'যাযাবরে'র গদ্যে শ্লেষ-যমকের কসরতো অতিপ্রকট হলেও (শিবরাম চক্রবর্তীর স্মারক), এঁদের গদ্য মোটামুটি মসৃণ,—শব্দ-প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃপ্তিকর,—ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রশংসনীয়।

'কল্লোল'-যুগে এবং তৎপরে বাংলা ১৩৩৮-এ 'পরিচয়ে'র জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি—গদ্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদের সকলের রীতির পৃথক পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লেখকদের সংখ্যার হারে রীতিবৈচিত্র্য বাড়েনি—সমগ্রভাবে বাংলার গদ্যলেখকদের নৈপুণ্য বেড়েছে। তাই, একসঙ্গে অনেকগুলি প্রিয় নাম মনে পড়া স্বাভাবিক:—অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, দিলীপকুমার রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, সম্বুদ্ধ, ভাস্কর, সুবোধ ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুশীল জানা, গজেন্দ্রকুমার মিত্র,

জ্যোতির্মালা দেবী, অমলা দেবী, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিমা দেবী, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রমথনাথ বিশী, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র সেন, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, ইত্যাদি সক্রিয়, সজাগ বর্তমান লেখকদের ভিন্ন-ভিন্ন রীতির সম্পদে একালের বাংলা গদ্যসাহিত্য পুষ্টি লাভ করছে। সদ্য-পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অক্লান্তকর্মী রাজশেখর বসু (পরশুরাম) বয়সে প্রবীণ, কিন্তু কাল-চেতনায় নবীনতম সুস্থ গদ্যলেখকেরও অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী। ধূর্জটিপ্রসাদ আজকাল কলম ধরেন কম,—কিন্তু ধরলে, তাঁর ব্যক্তিত্ব বোঝাবার জন্য টিপ্পনীকার-কে ডাকতে হয় না। রাণী চন্দ নিপুণ কথকদের নিপুণতমা শ্রুতিধারিকা। মৈত্রেয়ী দেবী স্বক্ষেত্রে তাঁরই মতো শক্তিমযী। চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা' স্বাদে নবীন! বাংলা বিজ্ঞাপনের গদ্য-লিখিয়েদের মধ্যে নীলিমা দেবী স্বনামধন্যা। বিজ্ঞান-বিষয়ে বাংলায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে গিরীন্দ্রশেখর বসু, সত্যচরণ লাহা, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পশুপতি ভট্টাচার্য্যের নাম একসূত্রে গাঁথা চলে। বিশেষজ্ঞ 'পণ্ডিত'-লিখিয়েদের মধ্যে এই প্রবন্ধের সুরুতে (৩৮ পৃঃ) যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া আছেন যদুনাথ সরকার, মহেন্দ্রনাথ সরকার, ক্ষিতিমোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী দাস, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কালিদাস রায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ইত্যাদি। অতুলচন্দ্র গুপ্তের পাণ্ডিত্য আদর্শ ভদ্রতার মতোই অ-দৃশ্য, কিন্তু পাঠকের মর্মস্পর্শী। নলিনীকান্ত গুপ্তের গদ্যে তাঁর তথ্যজ্ঞানের ভার কিছু বেশি পড়েছে,—কিন্তু পূর্ববর্তী শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী'র ভারসর্বস্বতা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। যামিনীকান্ত সেনের 'আর্ট ও আহিতাগ্নি'-র গদ্যরীতি এই সূত্রে স্মরণীয়। সাংবাদিকদের মধ্যে ৺রামানন্দ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরে

আরো কয়েকটি নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—কিন্তু সকলের নামে নামাবলী বোনবার দরকার নেই। হাল আমলের বাংলা গদ্যে—বিশিষ্ট কয়েকটি রীতির বিভাগ অনুসারে—কোনো রকম পরিবার-ভেদ কল্পনা করা চলে কি না, সেই কথাটিই এখানে বিচার্য। সেই বিচারে মোটামুটি চারটি পরিবার দেখা যাচ্ছে: প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী শাখাটি; দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের সাধুরীতির অনুকারী বা অনুসারী শাখা; তৃতীয়টি হলো বীরবলী,—চতুর্থটি 'সুধীন্দ্রনাথী'। শেষ রীতিটি বীরবলী রীতিরই সাক্ষাৎ বংশধর। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আলোচনায় প্রমথনাথ বিশী ('বাংলায় লেখক': ১ম খণ্ড) গদ্যের গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দ নামে যে ত্রিশাখা কল্পনা করেছেন,—সেই বিভাগ মনে রেখে বলা যায়—প্রথমোক্ত দুই শাখায় ছিলো 'গীতি' ও 'লেখনী'র মিশ্রস্পন্দন, শেষের দুটিতে আছে বাক্ ও লেখনীর মিশ্রস্পন্দন।

বঙ্কিমী, রবীন্দ্রনাথের সাধুরীতির অনুসারী, বীরবলী এবং সুধীন্দ্রনাথী—আধুনিক বাংলা গদ্যের এই চারটি মুখ্য শ্রেণী সহজেই চোখে পড়ে। তাছাড়া আছে কাব্যমুখী গদ্য,—এবং উপভাষা-খচিত গদ্য। প্রথমটির দেখা মেলে অবনীন্দ্রনাথ-দক্ষিণারঞ্জনের রচনায়,—দ্বিতীয়টির মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববঙ্গীয়তায়, অচিন্ত্যকুমারের আদালতী-চাষী-মগী বুলির সিঞ্চনে, তারাশঙ্করের বীরভূমী-সাঁওতালীর অকুণ্ঠ প্রয়োগে। আধুনিক বাংলা গদ্যের বিচিত্র অনুশীলনে যাঁরা সক্রিয়তম, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বনফুলের নাম সর্বাগ্রগণ্য। গদ্যকে এঁরা স্বচ্ছতায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যে সুবোধ্য ও শোভন করেন,—গুরু-লঘু, তন্দ্রালু অথবা সজাগ, শিথিল অথবা সতর্ক—সকল অবস্থার সকল অনুভূতি প্রকাশের কাজে বাংলা গদ্য এঁদের কলমে মসৃণভাবে নিঃসৃত হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু সুসমর্থ গদ্য-লেখকদের হাতেও তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বিরল।

কোনো শক্তিমান লেখকই তাঁর প্রকরণের প্রতি উদাসীন থাকেন না। প্রসঙ্গ-নির্বাচন ঘটতে থাকে জীবনের অভিজ্ঞতার ধারায়, শিল্পীর নির্বাচনী চেতনার গুণে,—আর, সেই সঙ্গে শিল্পের রূপ বা বাহন বা প্রকরণ বিষয়ে পরিমার্জন চলতে থাকে শিল্পীর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের শাসনে। একালের কর্তব্যনিষ্ঠ বাঙ্গালী লেখকদের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে। স্থান-সংকোচের কথা মনে রেখেও, বুদ্ধদেব বসুর অতিকায় উপন্যাস 'তিথিডোর' থেকে বাংলা গদ্য

সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিকতম পরীক্ষার কিছু নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হলো :

'আতা গীতিকে ধাক্কা দিয়ে বললো ওঠ না, সরস্বতী বললো সত্যেন তাহ'লে, উজ্জ্বল আলোর সিঁড়ী দিয়ে নামলো দু'জনে, উজ্জ্বল একতলা পেরোলো, কেউ নেই, চুপ, শাশ্বতী বললো স্বাতী কি, শোভা ভাবলো ঘুম ; অন্ধকার কালো, রিকশর দুই চোখই উজ্জ্বল, টুংটাং, চুপ, সব চুপ, টুংটাং, আরো কালো মাথার উপর আকাশ, আরো উজ্জ্বল আকাশের তারা, তারা, কত !'

'তিথিডোরে'র (রচনাকাল : ১৯৪৬-৪৯) শেষ দু'এক পাতার এই গদ্য বহুশ্রুত James Joyce-এর স্মারক। তবে জয়েসীয় উল্লম্ফন,—অন্বয়গত এবং শব্দগত খামখেয়ালীপনা বুদ্ধদেবের ধাতে সয় না। ওপরে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তাতে—কাব্য এবং গদ্যের ভেদরেখা যেন মুছে যেতে চেয়েছে। যুক্তিজীবী গদ্য যেন স্বপ্নময় কবিতার দেশে ছুটি পেয়েছে !

এই সূত্রে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ওঠা স্বাভাবিক। বুদ্ধদেবের কলমে উপন্যাসের তন্দ্রালু উপসংহারে কাব্যসীমাস্পর্শী অর্ধজাগর গদ্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু, দক্ষিণারঞ্জনের স্বাভাবিক মর্জিই হলো কাব্যাভ। তাছাড়া তিনি হলেন কিশোর-রাজ্যের শিল্পী,—রূপকথা সেখানকার হাওয়ায় ভাসে,—ছুটি সেখানকার স্বাভাবিক দাবী,—ব্যাকরণের ছুটিও সেখানকার বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণারঞ্জন অনেক সময়ে বাক্যের ব্যাকরণসম্মত অন্বয় এড়িয়ে চলেন,—তবে, Joyce-এর মতো যুদ্ধসাজে নয়,—Lewis Carol অথবা সুকুমার রায়ের মতো সর্বপ্রশংসিত রাজবেশে ! অবনীন্দ্রনাথ এবং দক্ষিণারঞ্জন উভয়েই কিশোর-রাজ্যে সর্ববন্দিত ;—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে তার বাইরেও সফরে বেরুতে হয়। আটপৌরে এবং পোষাকী সর্বপ্রয়োজনেই তাঁর রীতি হলো চিত্রল রীতি। মনোমোহন ঘোষ ঠিকই বলেছেন,—'রাজকাহিনী, শকুন্তলা ক্ষীরের পুতুল, নালক—এগুলি যেন এক একটি জীবন্ত চিত্রশালা'।* কিন্তু শুধু এই বইগুলি কেন ? 'ভূতপত্রীর দেশে'তে যেমন, 'বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'তেও তেমনি—মনের ছবি যেন চোখের তারায় ধরা দেয়—কখনো দেখা যায় দিগ্‌বলয়ের ধূ ধূ ঝাপ্‌সা রেখা, কখনো দেখা দেয় কাছের জগতের গোলাপী, বাসন্তী, সবুজ, হলুদ, নীল, বেগুনি, রাঙার রামধনু। তবে, অণুবীক্ষণে ধরা

* বাংলা গদ্যের চারযুগ

পড়ে—অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রবীন্দ্রনাথেরই খাসমহলের জিনিস। অঙ্গসংস্থানে অথবা উপাদানে তার কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই—আছে মননে, সেও কিঞ্চিন্মাত্র। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের কোনো কোনো রচনায় গদ্যের অঙ্গসংস্থানই অন্য জাতের। কাব্যের সংকেত এবং গদ্যের বিস্তার—এই দু'য়ের সন্ধিতে সংকরধর্মী মেরুদণ্ডহীন 'নজরুলী' গদ্যের সঙ্গে তার কতকটা আত্মীয়তা আছে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে তাকে 'কাব্যসংকর গদ্য' নাম দিলে কি বেমানান হবে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, সুধীন্দ্রনাথ,—অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন,—বাংলার বিভিন্ন উপভাষা,—পাশ্চাত্ত্য নানা জাতির গদ্যের আদর্শ,—সাংবাদিকদের প্রভাব,—অধ্যাপকদের প্রতাপ—এইসব বিচিত্র তরঙ্গের দোল খেতে খেতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্য আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের মাপে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। তার গতি কথ্য রীতির তীক্ষ্ণতম সংহতির দিকে। এই লক্ষ্যের সক্রিয়তম সাধক হলেন অচিন্ত্যকুমার এবং অন্নদাশঙ্কর। এঁদের গদ্যে বুদ্ধদেবের স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু ঢিলেমি নেই। গদ্যের মর্জি অনুসারে বুদ্ধদেব-কে বলা যায় রবীন্দ্র-শাসিত, আর, এঁরা হলেন রবীন্দ্রাতিশায়ী। বুদ্ধদেব আত্মতায় আবিষ্ট; এঁদের গদ্যে ফুটেছে নাট্যকারের আত্মস্থতা—অনুচ্চারিত কিন্তু অবধারিত।

বঙ্কিমের গদ্য মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উত্তাল;—রবীন্দ্রনাথের গদ্যে সমুদ্রগর্জন বিরল;—বীরবলের গদ্য কখনো ব্যঙ্গালাপী, কখনো সুখালাপী;—সুধীন্দ্রনাথের গদ্য মিত-গম্ভীর, কারুনিষ্ঠ;—অবনীন্দ্রনাথের রীতি বৈঠকী, অবকাশ-স্নিগ্ধ। 'কিন্তু বিনয় সরকারের বৈঠকে'র ত্বরা ও তপ্ততা নেই সেখানে। অচিন্ত্যকুমারের গদ্য তীক্ষ্ণ, সংহত, টংকারী। অন্নদাশঙ্করের সাম্প্রতিক লেখায়,—বনফুলের চলিত রীতির রচনায় এই লক্ষ্যেরই সন্ধান দেখা যায়। প্রেমেন্দ্রের বহু-প্রশংসিত সংলাপ-কুশলতায় এই প্রবণতাই সর্বোচ্চ।

বাংলা গদ্যের অস্থিসম্ভারের পুরাকালিক দৈর্ঘ্য—মেদমাংসের পৃথুলতা—অঙ্গচালনার অভিজাত মন্থরতা,—বিদ্যাসাগরী ক্রিয়াপদ, বঙ্কিমী অলংকরণ, চন্দ্রশেখর-দীনেশ সেনীয় আবেগমত্ততা এখন প্রায় লুপ্তপ্রচল। আধুনিক বাংলা গদ্য মিতবেণী এবং দ্রুতচারী। তার সংগীত শ্রুতিমুখী নয়,—মর্মমুখী; তার তরঙ্গ জলীয় নয়, ধাতব;—তাতে তরবারির দীপ্তি, ইস্পাতের নমনীয়তা!

পত্র ও পত্রসাহিত্য

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।

—আকাশ প্রদীপ

ভারত-সরকারের মহাফেজখানায় যে ১৭৫ খানি প্রাচীন বাংলা চিঠি সংরক্ষিত ছিল, স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে' সেগুলির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রায় পৌনে দুশো বছর পূর্বে আমাদের দেশে বৈষয়িক চিঠিপত্রের চেহারা কি রকম ছিল, এই বইখানি তারই নির্দেশক। এই সব চিঠিতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীশ্রীশিবঃ', 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ইত্যাদি দেবদেবীর নামোল্লেখের নীচে '৺মহামহিম মহিমা শ্রীযুত বড় সাহেবজিউ' কিংবা '৺ইয়াদদাস্ত ও দরখাস্ত শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়া' কিংবা 'মহামহিম শ্রীযুক্ত দ্রোক্তর সাহেব বরাবরেষু' কিংবা অন্যতর বিশেষণ-সমৃদ্ধ দীর্ঘতর শব্দমালায় পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই সব চিঠির ভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে গা ঘেঁষে বসেছে বিচিত্র আরবী-ফারসী শব্দ। স্বাক্ষরের জায়গায় কোথাও বা ব্যবহার করা হয়েছে ফারসী সাল। তারিখের উল্লেখে শকাব্দ, সন, খ্রীষ্টাব্দ, সকাবত, মোতাবেক ইত্যাদির যথেচ্ছ প্রয়োগ এই চিঠিগুলির বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাংলা চিঠিগুলি যখন লেখা হয়েছিলো, বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থ তখনো অপ্রকাশিত;— এদেশে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুদ্রিত বাংলা গদ্যের এবং গ্রন্থের ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হলো। তখন, বাংলা চিঠির চেহারাতেও ধীরে ধীরে বদল সুরু হলো।

বাংলায় ছাপা-গদ্যের যুগে চিঠির গদ্যও দ্রুত তালে আধুনিক হয়ে উঠলো। মাত্র এক শতকের মধ্যে বাংলা পত্রধারা তার বন্ধুর উৎসক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে একেবারে বৈচিত্র্যময় সাহিত্যসঙ্গমে প্রবাহিত হয়ে এলো। অষ্টাদশ শতকের পূর্বোক্ত চিঠিগুলির সঙ্গে উনিশ শতকের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কি সহজসাধ্য অনুষ্ঠান?

ইতিহাসে অনুরক্ত পাঠক আরও অতীতে দৃষ্টি ফেরাতে বিমুখ হবেন না। প্রায় চারশো বছর পূর্বের একখানি চিঠির নকল পাওয়া গেছে বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত-আলোচকদের প্রসাদে। এই চিঠিখানি লিখেছিলেন কুচবিহারের মহারাজ নর-নারায়ণ,—এবং এ-পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিও সামান্য লোক ছিলেন না। আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে সম্বোধনের উদ্দেশ্যে এই চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, তার একটু নমুনা দেওয়া হলো :

"স্বস্তি সকল-দিগ্‌দন্তি-কর্ণতালাস্ফাল সমীরণ-প্রচলিত হিমকর-হার-হাস-কাশ-কৈলাস-প্রান্তর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ-ত্রিদশ তরঙ্গিনী-শলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ প্রচণ্ড ধীর ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবারসকল দিক্‌-কামিনী-গীয়মান-গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রতাপেষু।"...

বিশেষণ-বিলাসীরা এর পর হয়তো বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র কথা ভাববেন। কাদম্বরী-কাব্যের বিশেষণ-প্রাচুর্যের মূলে যে মনোভাবটি কাজ করেছে, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক তাকে বলতে পারেন বিলসনেচ্ছা বা exhibitionism,—এবং সে-ইচ্ছার পোষক ছিলেন একজন কবি। পক্ষান্তরে, আহোমরাজ স্বর্গদেবের উদ্দেশ্যে এই যে বিশেষণের ঘটা, এর মূলে কোনো কবি ছিলেন না,—এ হলো শুধু এক রাজার প্রতি অন্য এক রাজার রাজকীয় সম্ভাষণ মাত্র। এ বাচালতা আর যাই হোক, সাহিত্যিক কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত নয়। কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এ চিঠিও বৈষয়িক চিঠি,—অষ্টাদশ শতকের বৈষয়িক বাংলা চিঠির সঙ্গে এর রীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। শব্দতত্ত্বানুরাগীরা ভিন্নকালবর্ত্তী এই পত্রমালায় শব্দ-প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখে খুসি হতে পারেন। কিন্তু এ-সব চিঠি যে সর্বপ্রকার সাহিত্য-সম্পর্ক-বিমুক্ত রচনা, এ অভিমত সর্ববাদিসম্মত।

বৈষয়িকতা-সম্পর্কহীন বাংলা চিঠির উৎস-কাল হলো খ্রীষ্টীয় উনিশ শতক। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ এই মন্দাকিনীর ভগীরথ। তবে, তাঁদের শ্রমে, প্রজ্ঞায়, বিদ্যাবত্তায় বাংলা ভাষায় লেখা চিঠি বৈষয়িকতার দৃঢ় শাসন স্থানে-স্থানে লঙ্ঘন করেছিল মাত্র। তাঁদের উপচীয়মান ব্যাপ্তিবোধ চিঠির মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ অল্প-বিস্তর আত্মপ্রকাশ করেছে। তথাচ, চিঠিকে তাঁরা প্রকৃত সাহিত্যের কৌলীন্য দেন নি।

মধুসূদনের ইংরেজী চিঠিগুলি যদি বাংলা ভাষায় লেখা হতো, তাহলে বরং

মধুসূদনকেই বাংলা পত্র-সাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া যেতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকের মধ্য-পর্বের অন্যান্য মনীষীরাও মূলতঃ চিঠির আটপৌরে স্বভাবের দৈন্যবোধ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সাহিত্যচর্চার সময়ে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গদ্যময় বাহন-গুলিকেই মেনে নিয়েছিলেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পত্রধর্মী পোষাকী রচনা, তার বিষয়বস্তু ভারতীয় কাব্য-পুরাণমূল,—প্রেরণা পাশ্চাত্ত্য। তাঁর এই রচনায় মধুসূদন Ovid-এর Heroic Epistles-এর প্রকরণ ও আদর্শের কাছে কী পরিমাণে ঋণী ছিলেন, সে-বিষয়ে বিতর্ক ওঠা অবান্তর নয়। সুপ্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো বাহন বা প্রকরণ আশ্রয় করে নয়,—'পত্রসাহিত্যের' স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করে নিয়ে সুখপাঠ্য চিঠি লেখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন নবীনচন্দ্র সেন। তবে নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) ঐতিহাসিক কারণেই স্মরণীয়,—সে পত্রমালার সাহিত্যিক মূল্য সামান্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকদের আনুকূল্যে বাংলায় 'পত্রসাহিত্য' উত্তরোত্তর কৌলীন্য অর্জন করেছে। তারপর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার গুণে বাংলাভাষায় সাহিত্যিক চিঠি শেলী, কীট্‌স্‌, লরেন্স, ব্রিজেস, প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পত্ররচয়িতাদের চিঠির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-সমসাময়িকেরা সেই আদর্শ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় ইত্যাদি পত্র-লেখকের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ; বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,—এঁদের সাহিত্যিক চিঠির সংখ্যাও কম নয়;—এবং ব্যক্তিগত চিঠির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রবন্ধ ও গল্পের মিশ্ররস পরিবেষণের চেষ্টা এ-কালে যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দেবেশচন্দ্র দাস এবং 'যাযাবর'-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার।

'পথে ও পথের প্রান্তে' নামক পত্র-সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত

প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনার মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে।

এই মন্তব্য থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চিঠি যখন সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে, তখন তা' ব্যক্তিগত মননধর্মী প্রবন্ধ অথবা গীতিকবিতারই সামিল হয়। শেষোক্ত সাহিত্য-শাখাটি অবশ্য রূপগত বৈশিষ্ট্যে পৃথক,—যদিও, অন্তর-বিচারে প্রথমটিরই সদৃশ। প্রথমোক্ত শাখার অন্তর-বিচারে আবার দুই উপশাখার বিভাগ সুপ্রশস্ত; এক হলো, গম্ভীর ধরণের রচনা, দ্বিতীয়টি, লঘু বিষয়ের আলাপ। সাহিত্য-পদবাচ্য চিঠিরও এই দুই মূর্তি চোখে পড়ে। Lucas, কিংবা Robert Lynd, কিংবা Keats-এর চিঠি গম্ভীর মননের দৃষ্টান্তবহ,—পক্ষান্তরে, Ellen Terry-র উদ্দেশে লেখা Bernard Shaw-র পত্রমালা হলো লঘু আলাপের দর্পণ,—কদাচ গম্ভীর।

সাহিত্য-পদবাচ্য চিঠির বিশ্লেষণে ভাবাবেগেরও দুই প্রকৃতি ধরা পড়ে—কোনো চিঠিতে দেখা যায় কেন্দ্রনিষ্ঠ মনন অর্থাৎ intensive emotion, আবার, কোথাও ফুটে ওঠে লেখকের ভাবকল্পনার নানাচারিত্ব—ইংরেজিতে যাকে বলে, discursive emotion.

রবীন্দ্রনাথের পত্রধারায় চিঠির এই বিচিত্র প্রকৃতির বিচিত্র প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি চিঠিতে তিনি পত্রতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা চালিয়েছেন। এমনি একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প, যে দু'চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে।

[৪ শ্রাবণ ১৩৩৬]

অনুরূপ আর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন :

আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরাণো হোলো না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলেছে, এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর। [১৮ই কার্তিক, ১৩৩৫]

সংস্কৃত কাব্যে চিঠি লেখার প্রসঙ্গ কোনো কোনো জায়গায় যে না উঠেছে, এমন নয়। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও বররুচির 'পত্র কৌমুদী'র কথা ধরা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বা লক্ষ্যে মনকে বেঁধে না রেখে অনিমিত্ত মননের দাক্ষিণ্যে চিঠিকে সাহিত্য করে তোলা বাংলা সাহিত্যেরই আধুনিক কীর্তি। অবশ্য, বাংলায় মেয়েদের লেখা চিঠি এখনও সাহিত্যের সর্বজনীন কোনো গ্রন্থাগারে জায়গা পায় নি। তার কারণ, বোধ হয় এই যে, মেয়েদের পর্দা এদেশে বেশীদিন ঘোচেনি—কিংবা হয়তো নিজেদের পর্দাবিমুক্ত অভিভূত অবস্থাটা তাঁরা এখনো ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অদূর ভবিষ্যতে মুক্ত মননের বৈচিত্র্যে আর মেয়েলি মমতার সৌরভে তাঁদের অনেক চিঠিই হয়তো সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠবে। চিঠিতে সাহিত্যগুণ সঞ্চারণের প্রক্রিয়ায় এই দুটি সম্পদই অত্যাবশ্যক,—মননও দরকার, মমতাও অনিবার্য ;—আর সে মমতা মানে ভোগমগ্নতা নয়,—দ্রষ্টার মমতা, ভোক্তার নয়! রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিতে গিয়ে অন্য এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়। [৬ই কার্তিক, ১৩৩৬]

মমতা ও মননের শাসনই সাহিত্য-পদবাচ্য চিঠির গতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই, চিঠির সাহিত্যিক মূল্য যেখানে স্বীকৃত হয়, সেখানে তার রূপকল্পের বাঁধাবাঁধি কোনো আদর্শনিষ্ঠার যাচাই চলে না। রবীন্দ্রনাথ ঐ যে বলেছিলেন, 'ভরতি মনের বকুনি',—সেই কথাটিই এই প্রসঙ্গে পুনর্বার স্মরণীয়। লেখকের ভাবের ক্ষিপ্রতা ও চলচ্ছক্তি অনুযায়ী চিঠির অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গাবলীর অবতারণা ও বিন্যাস ঘটে থাকে। বৈষয়িক চিঠি হলো এই আইনের ব্যতিক্রম। সে-ধরণের চিঠি লেখবার আদর্শের জন্য বিচক্ষণ লোকেরা পরিমিত বিনয় ও প্রভূত বার্তাবহ সুনিপুণ পত্রমালার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করে থাকেন। পক্ষান্তরে, সাহিত্যপদবাচ্য চিঠি সাহিত্যের অন্যান্য রূপের মতোই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল। কবি Cowper তাঁর একখানি চিঠিতে বলেছিলেন :

In fact, critics did not originally beget authors; but authors made critics. Common sense dictated to writers the

necessity of method, connexion, and thoughts cougruous to the nature of their subject; genius prompted them with embellishments; and then came the critics.

[Letter to the Rev. S. Newton—April 26, 1784].

মন্তব্যটি মোটেই অভিনব নয়। তবু, সাহিত্যপদবাচ্য চিঠিকে যাঁরা বৈয়াকরণ-আলংকারিকের নির্দেশ-মানা কেতা-দুরস্ত মূর্তিতে চরমান দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে এ মন্তব্য আশু-আরোগ্য-সাধক প্রতিপন্ন হবে।

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে লিখেছিলেন:

জেগে উঠে মহানন্দ,
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—
পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাপা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম!

আধুনিক সাহিত্যের 'বাস্তবতা'

যুক্তি দিয়ে যাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়, তার জন্ম মনের আগ্রহ একটি সম্যক আশ্রয়ে পরিসমাপ্তি পায়। মননের এই জাতীয় অধিকার স্ফটিক-মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়, মনে হয়। সে মূর্তি স্বচ্ছ, সুসীম, স্পর্শসহ। মননের আরো এক মূর্তি আছে,—তাকে বলা যায়, ছায়ামূর্তি। সে মূর্তিতে রূপ ও অরূপের সেতুবন্ধন ঘটে,—কল্পনা মুক্তি পায়,—অবিশ্বাসের প্রহরীগুলো নীরব তিরস্কারে ধিক্কৃত হয়ে শান্ত হয়।

সাহিত্যে সেই ছায়ামোহমুগ্ধ মানবচিত্তের বিলাসই পুনঃপুনঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। সংসারাসক্ত মানববুদ্ধি এই অলৌকিক মোহ থেকে আত্মরক্ষা করতে না পেরে সাহিত্য-বিচারে বাস্তবতা ও অবাস্তবতার সম্প্রদায়-ভেদ প্রচার করে এসেছে। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় পার্থক্য আপেক্ষিক ভেদ ঘোষণা করে

মাত্র, কোনো কাব্যই অবিমিশ্র বাস্তবতাধর্মী হতে পারে না। অর্থাৎ, বস্তু যেখানে ভাবব্যঞ্জনাহীন বস্তুরূপেই সুসম্পূর্ণ, সেখানে কবিকল্পনা কর্মহীন থাকে; এবং বস্তুরাজ্যে কবি যে-কাজেই লিপ্ত থাকুন না কেন, কাব্যরাজ্যে তাঁর প্রবেশ-পত্রের জন্য কল্পনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দিনের আলোয় যে গাছটি বহুপরিচিত, অতি সাধারণ এক দৃশ্যবস্তুমাত্র মনে হওয়া স্বাভাবিক, রাত্রির ছায়াপাতে সেই প্রাকৃত বৃক্ষই অপ্রাকৃত কল্পতরুতে রূপান্তরিত হতে পারে। কবি-কল্পনাও এক রকম ছায়া,—অথবা এক রকম আলো, যার গুণে বস্তুর নবকান্তি চোখে পড়ে।

রসবিচারের ক্ষেত্রে একাধিক স্থায়ী ভাব ও রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেও একটি রসকে যেমন 'আদি রস' নামে অভিহিত করা হয়, অর্থালংকারের মধ্যেও তেমনি একটি আদি-অলংকারের মর্যাদা দেওয়া যায় কাকে?—সে প্রশ্নের উত্তরে উপমা, রূপক, ব্যতিরেক প্রভৃতি তুলনাবাচক অর্থালংকারের কথাই পুনঃপুনঃ মনে পড়ে।* প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংলগ্ন প্রাক্তন মনন ও বাসনার বিপুল ছায়ামোহস্পর্শেই তো রূপের রাজ্য অপরূপ দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়,—বাস্তব জগতের সীমা মুছে গিয়ে বিপুলতর ক্ষেত্রের, বিপুলতর চেতনার স্পর্শ মানুষের অধিগম্য হয়। প্রাথমিক কাব্যানুশীলনেও এই শ্রেণীর অর্থালংকার আত্মপ্রকাশ না করে পারে না। দৃষ্ট রূপকে অবলম্বন করে সেই রূপোৎসারিত ছায়ার আস্বাদনেই কবির কাব্যত্ব নির্ভর করে। মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই ছায়ার বৈচিত্র্য এবং জটিলতাও ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

এক আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবির রচনায় স্নানের বাস্তব উপকরণ 'বাথটব' সম্বন্ধে এই রকম ছায়াসৃষ্টির চেষ্টা ঘটেছে। সেখানে কবি বলেছেন,

> গরম জল যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসে,
> সাদা চীনা মাটির অস্তর্-লাগানো
> 'বাথ্‌টবের' তখন যে চেহারা হয়,
> আমাদের ক্রমবিলীয়মান বীর্যের প্রেরণাও
> সেই রকম।

* Aristotle বলেছিলেন, রূপক-ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যই হলো কবিপ্রতিভার বিশেষত্ব

শৌর্য সাধনের ঐতিহ্য যে শরীরে-মনে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, তার সঙ্গে একটি ম্লানপাত্রের উপমা প্রয়োগের মূলে যে-দৃষ্টি, যে-রকম চেতনাই থাকুক না কেন, এই কাব্যাংশেও সাদৃশ্য সন্ধানের কবিজনোচিত অনিবার্য প্রয়াস সুপ্রকাশিত। উপমান ও উপমেয়,—এই দুই পৃথক বস্তুর সমধর্মিতা অবলম্বন করে কবির আপন অনুষঙ্গক্ষেত্র থেকে যথোচিত অভিজ্ঞতার উল্লেখ-সূত্রে সহৃদয় ব্যক্তির অনুভূতিকে স্পন্দিত ও গাঢ়তর করবার জন্যই এখানে কবিকল্পনার প্রয়াস ঘটেছে।

রসতত্ত্বে ব্যবহৃত পারিভাষিক 'ধ্বনি'-শব্দটিও এই বস্তু-অতিশায়ী ছায়ার রম্যতার প্রকাশক। শিশুপাঠ্য প্রাথমিক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একদা 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', এই বর্ণনায় কাব্যের আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, এই বর্ষণের চিত্রও ছায়াছুট নয়। বাইরের জগতের প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সূত্র ধরে এখানে অন্তর্জগৎ এক পরম অভিজ্ঞতার বিস্ময় উপলব্ধি করে। মর্তের মধ্যে এই রকম অমর্তের আবির্ভাব সম্বন্ধে কবি লিখেছেন,

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি…

এই অমর্তের অনুসন্ধানে,—দূরলোকের অনিবার্য আকর্ষণে চলেছে রসলোকের যাত্রী! এই যাত্রা দৃশ্যলোক থেকে অদৃশ্যের অভিমুখে অনন্ত-প্রসারিত। সেখানে যুগযুগান্তের পরিমাপ অর্থহীন। সমস্ত বিচ্ছেদ-চিন্তা সেখানে বিলুপ্ত হয়। কবি লিখেছেন,

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা ল'য়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।

বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের বস্তুপ্রীতি ও জড় বন্ধনাসক্তি যতোই পরিবর্ধিত হোক্ না কেন, কবি-কল্পনার দুর্মরতা তবু সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, বস্তুকে অস্বীকার করা তার ধর্ম নয়। Robert Lynd বলেছিলেন, 'Poetry has a double birth : it has a utilitarian father and an aesthetic mother'। ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির স্তরে স্তরে বস্তু-সীমা উত্তরণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাই সকল যুগেই রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নপ্রবণতা দুরারোগ্য। কাব্যে, কবির সেই প্রেরণাই সাধারণ অভিজ্ঞতার মাটি থেকে অলৌকিক লাবণ্যময়ী প্রতিমা গড়ছে। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে—আয়ুর পর্বে পর্বে সেই প্রতিমাই চিরন্তনী প্রতিমা। তার বোধন আছে, বিসর্জন নেই।

ক্ষুদ্র দেশ-কালে আবদ্ধ মানুষ সাহিত্যের আনন্দলোকে বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে তার নিবিড় যোগটি উপলব্ধি করে। সাহিত্য যদিও বাস্তব জীবন থেকেই উদ্ভূত, তথাপি, বাস্তব জীবনের পরিসীমার মধ্যেই তা' অবরুদ্ধ নয়।

আমাদের জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আছে বটে,—কিন্তু সেই প্রবাহে সদৃশ ঘটনার সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা নেই। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক—এঁরা সকলেই নিজের-নিজের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাকে এক একটি পরম উপলব্ধির সূত্রে গ্রথিত করে পাঠকের চিত্তে সেই-সেই ধ্যানমাল্য উপঢৌকন স্বরূপ সঞ্চার করে থাকেন। অন্তর্দৃষ্টি ও ভূযোদর্শন,—মহৎ সাহিত্যিকের পক্ষে এই দুটি সামর্থ্যই সমান আবশ্যক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য জীবনের বস্তুসম্পদের প্রতি উদাসীন নয়,—আবার, সান্তের সঙ্গে অনন্তের সমীকরণেও বিমুখ নয়।

যুগ-পরিবেশের নির্মম ও অতিমাত্রিক দাবীর অত্যাচারে কোনো কোনো লেখক সান্ত জগতের অভিজ্ঞতাকে এই অনন্ত লোকের শুদ্ধ চৈতন্যে স্থাপন-রক্ষণ ও পোষণের দায়িত্ব বিস্মৃত হন, অথবা, উপেক্ষা করে থাকেন। তাঁরা হলেন তাঁদের সমসাময়িক দেশ-কালের সাংবাদিক। আর এক দল ক্ষীণচিত্ত, মসীবিলাসী দেশ-কালের বাস্তব আলিঙ্গনের অকপট তাপ এবং গ্লানি থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টায় অলীক, অতিমর্ত্য, মায়ালোকের কুহেলিকায় আত্মসমর্পণের স্বপ্ন দেখেন। তাঁরা হলেন পলাতক। সাংবাদিক এবং পলাতক,—এই দুই সম্প্রদায়ের দোষগুলি পরিহার করে, গুণগুলি আত্মসাৎ

করে,—বাস্তব জগতের সঙ্গে অনন্ত রসলোকের সমীকরণ ঘটিয়ে, যে সাহিত্যিক মানুষের মনোলোকের সঙ্গে বস্তুলোকের রসময় যোগটি পরিশীলিত বাক্যে এবং উপযুক্ত প্রকরণে অভিব্যক্ত করে তোলেন,—তিনিই হলেন সাহিত্যলোকের মহৎ স্রষ্টা,—কাব্যমালঞ্চের সার্থক মালাকার।

আমাদের সাহিত্যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে—প্রধানতঃ, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের আন্দোলনে তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠা বা realism-এর দিকে প্রবল একটি ঝোঁক মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, গোকুল নাগ, যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক), অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব,—এবং প্রায় একই সময়ে প্রবোধ কুমার সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায় ইত্যাদি লেখকরা গদ্যে-পদ্যে তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। এইসব খ্যাতনামারা ছাড়া স্বল্পখ্যাতিমান লেখকদের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁদের বস্তুনিষ্ঠার বিশ্লেষণ করে দেখলে প্রধানতঃ দুটি সামগ্রী চোখে পড়ে,—প্রথমতঃ, তৎকালীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবপ্রসূত দুঃখবোধ,—দ্বিতীয়তঃ, যৌনাকাংক্ষার অতিরেক-অবদমন-ঘটিত যৌনচিত্র রচনার প্রবণতা,—তা' সে-সব চিত্র পূর্ণাঙ্গই হোক, আর, সংকেতমাত্রই হোক। আলোচ্য দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের প্রতাপান্বিত অভ্যুদয়-সূত্রেও নিকট ও অব্যবহিত বস্তুবেষ্টনীর প্রতি বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের অনুরাগ-চর্চা উদ্দীপনা লাভ করেছিল। তার আগে 'সবুজপত্রে'র দল বলে গিয়েছিলেন,

> দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্র ধর্ম্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার জন্য কোনও খেদ নেই।*

অতএব, এই ভূমিকায়,—১৩৩০-এর এপারে-ওপারে প্রায় এক যুগের, অর্থাৎ বারো বছরের বাংলা সাহিত্য তথাকথিত বাস্তবতা বা বস্তুনিষ্ঠার নামে কতকটা যে অনাচারী হয়ে পড়বে, সে-ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। ১৩৩৫-এ প্রকাশিত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রূপ ও রস' নামক গ্রন্থে এই দুর্লক্ষণ সম্পর্কে যে খেদোক্তিটি স্থান পেয়েছে সেটি এখানে তুলে দেওয়া হলো:

* বীরবলের হালখাতা: বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ

আমাদের আজকালকার কাব্যজগৎ উপন্যাসজগৎ উপদেষ্টার ও প্রচারকের গর্জনে মুখরিত, ঋষির প্রশান্ত সৌন্দর্যানুভূতি সেখানে অতি বিরল।...

আজকালকার সাহিত্যের বিশেষত্বই এই যে, তাহা সমস্যামূলক (a thése)।

এই শ্রেণীর বস্তুনিষ্ঠার ধারা বাংলা সাহিত্যে আজ প্রায় বছর তিরিশেক অক্ষুণ্ণ প্রবাহে চলে আসছে। সেই সূত্রে, সাহিত্যের ছদ্মবেশে, বহুসংখ্যক স্বল্পক্ষম এবং অক্ষম লেখকের সাংবাদিক রচনা বাজার গরম করে রেখেছে।

বাংলা সাহিত্যে ১৩৩০-এর বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় সূত্রবৎ সংক্ষেপে এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, যখনই আমাদের দেশে উল্লেখ-যোগ্য কোনো সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মসংক্রান্ত অথবা প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেছে, সেই-সেই ব্যাপার অবলম্বন করে গদ্য-পদ্য রচনার আগাছায় তখনই দেশ ছেয়ে গেছে। এ ব্যাপার অস্বাভাবিক নয়। এ-থেকে জাতির লেখনীচালন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে শক্তিমানদের তুলনায় অশক্তের সংখ্যানুপাতিক অপরিসীম আধিক্য দেখে কিছু নৈরাশ্যও যে না-ঘটে, এমন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর, বাংলা মাসিক-সাপ্তাহিক-ত্রৈমাসিক-বার্ষিক ইত্যাদি কাগজগুলি যুদ্ধঘটিত কথা-উপকথায় পূর্ণ থাকতো ;—তারই মধ্যে ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন গেছে, ৪৩-এ মন্বন্তর গেছে,—যুদ্ধের পরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা গেছে,—বঙ্গবিচ্ছেদের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা ঘটেছে—এবং সে দুর্ভাগ্য এখনো কাটেনি ;—তারপর, যুদ্ধের আদিতে-মধ্যে-অন্ত্যপর্বে এবং যুদ্ধোত্তর বর্তমানেও পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদের চিন্তা রয়েছে। এই সব বস্তু বাংলার সগুস্তন সাময়িক সাহিত্যের দর্পণে কালের গতিতে যথারীতি প্রতিফলিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যে হতে থাকবে, তাতে আর সন্দেহ কি! একজন সমালোচক লিখেছেন :

এখনকার দিনে সমাজের নিম্নতন স্তরে যারা, তারা সবেগে সাহিত্যে এসে ভীড় করেছে—যা কুশ্রী, কদর্য্য, যা উপেক্ষিত, সেগুলো জড়ো হয়েছে রসশিল্পের আসরে। আধুনিকেরা বলছেন, এই দিকটাই হচ্ছে সত্যিকার দিক এবং এ দিকে নজর

না করায়, প্রাচীনদের দৃষ্টি ছিল অবাস্তব, এবং সেই জন্যেই অসত্য।*

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের এই আলোচনার পরবর্তী একটি অংশ এখানে সবিস্তারে তুলে দেখা দরকার—

এ যুগের রাজনীতি ও সংস্কৃতি মানুষকে যে চিন্তা-বিপ্লবের মধ্যে টেনে এনেছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতি সেই বিপ্লবকে যে-পরিমাণ পোষকতা করেছে, এবং সর্বোপরি রুশীয় সমাজতন্ত্র-বাদের ব্যাপক বিস্তার এই বিপ্লবকে যতটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার সুযোগ দিয়েছে, তাতে সাহিত্যাদর্শেও ওলট-পালট অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেছে। এই ভাব-বিপর্য্যয়কে মোটা কথায় বাস্তবতা আন্দোলন নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে বলা দরকার যে বাস্তবতা সংজ্ঞাটা আধুনিক আন্দোলনকে ষোল আনা বুঝতে সহায়তা করে না।

এর পর লেখক বলেছেন—

যা এতদিন অনভিজাত বলে উপেক্ষিত ছিল, তাকে গ্রহণীয় করে তোলাতেই যে বাস্তবতার যথেষ্ট মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তা নয়। বরং নূতন দৃষ্টি ও ভাবাদর্শ প্রবর্ত্তনের উন্মাদনায় আধুনিকেরাও বাস্তব থেকে ঠিক ততখানিই দূরে গিয়ে পড়ছেন, যতখানি দূরে ছিলেন প্রাচীনেরা রসাত্মকতার নাম নিয়ে।

কথাটি প্রণিধান-যোগ্য। এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে আর একটি কথা বলে নিই। ১৩৪০-এর অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'বাঁশরী'-নাট্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত 'বাস্তবতার' আদর্শ সম্পর্কে নব্য বাঙ্গালী সাহিত্যিক ক্ষিতীশের প্রতি অভিজাত-কন্যা বাঁশরীর মুখে কয়েকটি কথা আরোপ করেছিলেন। বাঁশরী ক্ষিতীশকে বলেছে,

---

* শতাব্দী ও সাহিত্য : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখো যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাচ্চা করে লিখতে শেখো।

এবং পুনরায় অন্যত্র বলেছে,

প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্‌ম্‌ নোঙরামিকে নয়।

একেই বলে শিল্পলোকের বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এই তত্ত্বটি নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই একই কাজ করতে হয়েছিল প্রায় শতবর্ষ পূর্বে। তাঁর কথাগুলি এই সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক:

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনামধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্র-নৈপুণ্যের প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা কি?*

রবীন্দ্রনাথ শিল্পলোকের বস্তুনিষ্ঠার স্বরূপ সম্পর্কে একাধিক স্থলে তাঁর একাধিক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। নিচে তাঁর আর দুটি উক্তি তুলে দেওয়া হলো:

ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই, যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিত ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে, এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম, জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের

* উত্তরচরিত (বিবিধ প্রবন্ধ)

মধ্যে ভুক্ত করে নেয়, সে অসুন্দর হলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।ক

একটি ইংরেজি আলোচনায় তিনি লিখেছিলেন—

And this is Reality, which is truth made our own,—truth that has its eternal relation with the Supreme Person.*

প্রথমে 'বাঁশরী' থেকে, এবং পরে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা থেকে এই যে উক্তিগুলি তুলে দেখা গেল,—এগুলির প্রতিপাদ্য বস্তু সহজবোধ্য। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, যে, মানব-জগতে মানুষের প্রবৃত্তি ও বিবেক আছে, এবং তারও ওপরে আছেন 'প্রকৃতি' বা 'ভবিতব্য'। প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবেকের সংঘাত চলেছে এবং এই সংঘাত সত্ত্বেও এক অলৌকিক ভবিতব্যের দ্বারা মানব-জীবন শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই ভূমিকায় দাঁড়িয়ে, শেষোক্ত ইংরেজি উক্তিটিতে তিনি সত্যকে আমাদের আত্মাশ্রয়ী উপলব্ধির বস্তু বলে স্বীকার করেছেন।

বলা বাহুল্য, এ স্বীকৃতি হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির স্বীকৃতি। যে-সমাজে এই রকম মন গড়ে ওঠে, সে-সমাজের মনোগঠন কি রকম? একজন আধুনিক পণ্ডিতের জবাব দেখা যাক:

The basic relation of society was to be freedom from any relation—the free merchant, the free labourer, and free capital. With each man thus freely following his desires, the best interests of society as a whole would, it was asserted, be served. †

ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় ব্যক্তি ও সমাজের এই হলো পারস্পরিক সম্পর্ক-বোধ। এখন, অন্যপন্থীরা অন্য কথা বলছেন—

But it is not true. Freedom is the product, not of the instincts, but of social relations themselves. Freedom is secreted in the relation of man to man.

ক সাহিত্যের পথে

* Personality : Rabindranath Tagore.

† Studies in A Dying Culture : Christopher Caudwell, (1938),

এই দৃষ্টির প্রসার ঘটেছে এ-কালের পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের মন থেকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনসমাজে,—তথা, লেখক-সমাজের মনে। ফলে, আত্মাশ্রয়ী বা স্বাশ্রয়ী সত্যোপলব্ধির ধারণা থেকে জ্ঞাতসারে অথবা অর্ধজ্ঞাতসারে একালের লেখকরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক বস্তুসম্পর্কগুলির পুনর্বিচারে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। খণ্ড ও সাময়িক,—বর্তমান ও প্রাদেশিক জীবনচিত্রকে অনন্তের পটেই যে স্থাপন করতে হবে,—তাই যে করা উচিত,—এ সম্পর্কে এ-কালের 'বাস্তব' সাহিত্যিকেরও কোনো সংশয় নেই। কিন্তু 'অনন্ত' বলতে 'ভবিতব্য'-শাসিত যে-অজ্ঞাতরাজ্যের ধারণা পূর্ববর্তীরা মনে মনে পোষণ করতেন, একালের ভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে সে ধারণা আর কোন ক্রমেই টিঁকে থাকতে পারছে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নামাঙ্কিত পুরোনো টাকা সংঘপ্রাধান্যবাদী এ-কালের বাজারে আর চলছে না ; পুরোনো সংস্কার এখন আমাদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে। একালের দুঃসাহসী জিজ্ঞাসুরা ব্যাপারটি তলিয়ে দেখে বলছেন,—

Worn-out engines become brakes. Outworn truths become illusions. Bourgeois culture is dying of a myth.

কোন্ সমাজের সংস্কৃতি আজ মৃতপ্রায়? কোন্ সুখস্বপ্নের নেশায় বর্তমান কাল এই সন্ধিযুগের গ্লানি ভোগ করছে? ১৩৪৪-এ প্রকাশিত একটি বাংলা সংকলন-গ্রন্থ থেকেই এ দুটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যেতে পারে। এই বইখানিতে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

বর্তমান জগতে ঘটনা বড় একঘেয়ে, এবং তার কারণ যন্ত্রের আধিপত্য নয়, যন্ত্রাধিপতির আধিপত্য।...পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বল্লেন যে মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং গতিটা মায়া। কোনো মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ আছে। সাহিত্যে সনাতন তত্ত্বের, ঐতিহ্যের নজীর দেখানর মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার, কোনো একটি মুমূর্ষ মূল্যকে বোতলে পুরে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়। শবের দৌরাত্ম্য প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না।

ঐ একই গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,

মোটের উপর দেখি যে আমাদের সাহিত্যে একদিকে সনাতনী খাত প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে অদ্ভুত বৈদেশিকভাব (যৌন-ভাবাতিরেক) আসিতেছে। আমার মতে উভয়েই বেখাপ্পা। আমাদের সাহিত্যে 'realism'-এর অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। আমরা 'space and time'কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছি না।*

এই সময়ের বাংলা সাহিত্যে গতপ্রাণ সামন্ত যুগের অথবা অস্তোন্মুখ ধনতান্ত্রিক যুগের মুমূর্ষু মূল্যকে 'শাশ্বতে পরিণত' দেখবার যে দুর্মর আশা এঁরা টিঁকে থাকতে দেখেছিলেন,—বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করে Caudwell তারই নাম দিয়েছিলেন—'পুরাণ স্বপ্ন' বা myth ;—ধূর্জটিপ্রসাদ তাকেই বলেছিলেন 'শবের দৌরাত্ম্য'—এবং ভূপেন্দ্রনাথ সেই কারণেই খেদোক্তি করে জানিয়েছিলেন যে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে realism-এর বদলে anachronism ঘট্‌ছিলো।

ভাবাদর্শ পরিবর্তনের সময়ে সকল দেশে এবং সকল কালেই অন্তর্দৃষ্টিহীন, ভূয়োদর্শনহীন, অল্পশক্তিমান একদল লেখক চটকদার, স্বল্পায়ু মৌশুমী ফুলের মতো আবির্ভূত হয়ে নবজাতকের চিত্ততোষণে মেতে ওঠেন। মহৎ শিল্পীর কোনো গুণই তাঁদের থাকে না। মহৎ শিল্পীর আগমন সম্ভব করবার জন্যই বোধ হয় তাঁদের প্রয়োজন আছে। প্রকৃত শক্তিমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয়ে শিশিরাস্তরণের মতো তাঁরা শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যান। বাংলা সাহিত্যে গত তিরিশ বছরের মধ্যে,—অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যেই রবীন্দ্র-কালীন ভাবাদর্শে আর আমাদের মন উঠছে না—বলে, যখন থেকে রব উঠেছে, তখন থেকে অদ্যাবধি, এই রকম যুগ-তোষক 'সাহিত্যিক' দলে দলে এসেছেন এবং গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'নূতন দৃষ্টি ও ভাবাদর্শ প্রবর্তনের উন্মাদনায় আধুনিকেরাও বাস্তব থেকে' দূরে গিয়ে পড়েছেন,—সেখানে তিনি এই যুগতোষক আধুনিকদের কথাই ভেবেছেন। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে এই সময়ের মধ্যে শুধু যে যুগতোষণই ঘটেছে, তা' নয়,—সার্থক গল্প-উপন্যাস-

* বন্ধনী চিহ্নভুক্ত অংশ বর্তমান লেখকের

কাব্য-নাটকও অনেক লেখা হয়েছে,—এবং সেইসব সার্থক রচনা নিকটতম বর্তমানকে এড়িয়েও চলেনি—আবার সর্বস্ব-ও মনে করেনি।

পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তথাকথিত যে 'আধুনিক'-দের কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' সেই দলের প্রতিভূ কল্পিতনামা ক্ষিতীশকে বলেছে, 'স্পষ্ট জানতে শেখো,...সাচ্চা করে লিখতে শেখো।' রবীন্দ্রনাথ বাঁশরীর মুখে 'বাস্তব সাহিত্য'-অভিপ্রায়ী বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের যে, সুপরামর্শ দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 'সাচ্চা করে' দেখবার জন্য একদিকে যেমন দ্রষ্টার পক্ষে অধ্যবসায় এবং প্রস্তুতি দরকার হয়,—অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের একটি লগ্নের আবশ্যিকতাও কি উপেক্ষা করা যায়? রবীন্দ্রনাথকে জিগেস করলে তিনি হয়তো বলতেন, 'সে লগ্ন ভবিতব্যের হাতে!' ভিন্ন-বিশ্বাসীরা সেই কথাটাই অন্যভাবে বলেন। রবীন্দ্রনাথ-উপাসিত Supreme Person-এর আনুকূল্য কামনা না ক'রে তাঁরা দাবী করেন,

> সমাজ পরিবর্তিত হয়, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, আর শিল্প সাহিত্যও নূতন রূপ লাভ করে। শিল্প ও সাহিত্যের সেই নূতন রূপ নির্ধারিত হয় নূতন সংস্কৃতির প্রভাবে।*

পণ্ডিতম্মন্য অন্যবাদীরা যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রযুগের মূল্যবোধ আমাদের সংস্কৃতি থেকে এখনো যে সম্পূর্ণ উবে যায়নি, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, এবং তৎপরে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক আলোড়নে আমরা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছি এবং হচ্ছি বটে,—সামাজিক সম্পর্কের অভ্যস্ত মাধুর্যেও যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই,—বেকার-সমস্যা এবং উদ্বাস্তু-সমস্যাও নগণ্য নয়,—তথাপি, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রযুগের পরবর্তী অন্য কোনো নেতৃনামবেদ্য অধ্যায় এখনো সুরু হয়নি। বর্তমানে যা চলছে,—তা' রবীন্দ্রযুগেরই অন্ত্যপর্ব,—অথবা, বড়ো জোর বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র-তিরোভাব-জনিত অবক্ষয় (decadence)-পর্ব। এই পর্বে

* 'সংস্কৃতির রূপান্তর' : গোপাল হালদার

আমাদের অভ্যস্ত রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের কিছু কিছু বদল হয়েছে বটে,—তবু সাহিত্যের আসরে যুগন্ধর নবীন স্রষ্টা কোথায়? নতুন সংস্কৃতি এখনও স্তন্যপায়ী। চিন্তাশীল শুভার্থীরা অবশ্যই তার পুষ্টি কামনা করবেন,—যুগতোষক অগ্রগামীরা তাকে দোলনায় দোল দেবেন,—কিন্তু যতোদিন সে-সংস্কৃতি সাবালক না হয়, ততোদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নামে সাংবাদিকতা, ব্যাপ্তির নামে বিভ্রান্তি এবং নতুনত্বের নামে উৎপাত যে কিছু পরিমাণে ঘটবেই, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে, ভরসা এই যে, রবীন্দ্রনাথের শুভব্যক্তিত্বের প্রসাদে বাংলা সাহিত্যের হাওয়া দীর্ঘকালের মতো সুরভিত হয়ে গেছে এবং সেই আবহের গুণে সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের গদ্য-পদ্যের হাত যে পেকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব, এই স্বল্পক্ষম মধ্যবর্তীদের শব্দচালনা যে চলনসই না-হবে, এমন আশঙ্কা নেই,—এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিমান, স্ব-কালচেতন, যুগ-স্রষ্টা লেখকের সুস্থতর বাস্তব দৃষ্টির স্বাস্থ্যকর, শক্তিবর্ধক, স্নিগ্ধোজ্জ্বল তাপ এবং দীপ্তির প্রতীক্ষা করতে করতে বাংলা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা ইত্যাদির আঙ্গিকে ও প্রকরণে আরো বিচিত্র পরীক্ষা আমরা দেখতে পাবো বলে আশা করতে পারি।

ধনতান্ত্রিকতার গঙ্গাযাত্রা সুরু হয়েছে,—পণ্ডিতদের এ সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত হয়, তাহলে তার অন্তর্জলির পরে গঙ্গালাভ পর্যন্ত নবীন উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষা করতে হবে,—ইতোমধ্যে পুরোনো শিল্পীরা দীর্ঘকালের অভ্যাস ভুলে সহসা দিব্য-জ্যোতির্ময়ী কোনো প্রতিমা গড়তে পারবেন বলে ভরসা হয় না,—তবে, রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে এবং পরে অদ্যাবধি যেমন অনেক ভালো পুতুল গড়া হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতেও তেমনি আরো কিছু গড়া হবে। 'পুতুল' কথাটা তুচ্ছার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না। প্রকৃত শিল্পরসিক ব্যক্তি পুতুলকেও অবজ্ঞা করেন না। পুতুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেই তা প্রতিমায় পরিণত হয়। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরোহিতের ডাক পড়ে থাকে,—কিন্তু ভক্ত দর্শক ব্যতিরেকে পুরোহিতের সাফল্য কি সম্ভব? কুমারী মেয়ো-র চোখে কালিঘাটের কালী-প্রতিমা বীভৎস এক পুতুল মাত্র;—আবার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চোখে তার ব্যঞ্জনা অন্য রকম! অতএব, সহিষ্ণু ব্যক্তিরা প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা পুজারীর সঙ্গে প্রাণ-প্রতীক্ষ্যমান ভক্তের সহযোগিতার প্রয়োজনটি অস্বীকার করতে পারেন না। যাঁরা হিন্দুধর্মের মর্মকথাটি জানেন, তাঁরা হিন্দুকে পৌত্তলিকতার অপবাদ

দেন না ; যাঁরা তা না-জানেন, তাঁদের তিক্তবচন স্বদেশে এবং বিদেশে বহুবার শোনা গেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই রকম। শব্দে, ছন্দে,—অধ্যবসায়ে, সহিষ্ণুতায় একালের রূপকার একালের অনেক রূপ ফুটিয়ে তুলছেন,—নানান্ মূর্তি গড়ছেন। কিন্তু সর্ববরেণ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাতার আজ সমূহ অভাব! সেজন্য, রূপকারকে দোষ দেওয়া সুবিচার নয়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপকার এবং পুরোহিত দেখা দেন একাধারে। অর্থাৎ যিনি ধ্যান করেন, তিনিই রূপ গড়েন। কাব্যের বিষয় যে-মনে ধরা দেয়, কাব্যের আঙ্গিক বা প্রকরণও সেখান থেকেই নিঃসৃত হয়। আজ বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান রূপকার-রা তাঁদের বহু-যত্নে-গড়া পুতুলকে-যে প্রতিমা করে তুলতে পারছেন না,—তাঁরা-যে বিপুলায়তন কোনো ভক্ত-সম্প্রদায়ের পুরোহিত হয়ে উঠতে পারছেন না,—বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বচিত্তজয়ী কোনো বাঙ্গালী সাহিত্যিক যে এ-কালে আবির্ভূত হচ্ছেন না,—সে অক্ষমতা কি শুধু এ-কালের বাঙ্গালী সাহিত্য-সাধকের ওপরেই সম্পূর্ণ চাপিয়ে দেওয়া উচিত? দেশে আজ নতুন যুগের নতুন বিশ্বাস কোথায়?—বীণাপাণির নববোধনের লগ্ন কি সত্যিই এসেছে? নতুন বিশ্বাস না-হয় এখনো ফুঠে ওঠে নি! প্রবল কোনো অবিশ্বাসই কি ফুটেছে? আস্তিক্য না থাক্—দৃঢ়-দুর্জয় নাস্তিক্য-ই বা কোথায়? দেশের জনসাধারণ এবং দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত যে বিরোধের বীজ ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশের,—তথা ভারতবর্ষের জীবনে বপন করে গেছে,—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে যে-কথা বলে গেছেন,—আজ সেই বিরোধের ব্যবধানটাই সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। সেই বীজ থেকে উৎপন্ন আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষবৃক্ষের ফল এতোদিনে দেশের পাকযন্ত্রে প্রবেশ করে সর্বশরীরে নৈরাশ্য ও নির্বেদের জালা ক্ষরণ করছে। তাই আজ দেশ থেকে দৃঢ় বিশ্বাস হলো অন্তর্হিত,—গভীর ধ্যান হলো অস্তগত। এখন মুষ্টিমেয় 'স্বাস্থ্যবান' ব্যক্তি তাঁদের বিত্তগত, অথবা, বিত্তনিরপেক্ষ বিরল ব্যাপক-দৃষ্টিক্ষমতাগত, কৃতিত্বের জোরে, হয়, পূর্ব-বিশ্বাসে আস্থাবান আছেন,—নতুবা, নব-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছেন। প্রথমোক্তদের কথা বর্তমান আলোচনায় ধর্তব্য নয়,—কারণ তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুদ্র বিত্তগোষ্ঠীগত,—বৃহত্তর, ব্যাপকতর যুগ-জীবন-প্রবাহ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মনোদর্পণে প্রাক্তন

সংস্কারের আবরণ দুর্মর,—তাঁদের সঞ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁদের নবজীবনের বাধা। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে মহৎ স্রষ্টার পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি তেমন কোনো মহৎ স্রষ্টামানসের আবির্ভাব ঘটে, তা'হলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বজনস্বীকার্য আধুনিকতার তিনিই হবেন স্রষ্টা—এ-কালের 'বাস্তবতা'-কে তিনিই দেবেন কালজয়ী ভাষা! তা' যদি না হয়,—তাহলে প্রতীক্ষা করতে হবে সেই বহুদুঃখ-পরিস্রুত শুভলগ্নের—যে লগ্নে, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শিশুর জন্ম হয়,—মূক, অন্ধ, নৈশ স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে,—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হন অমৃত!

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্রষ্টা ও সমালোচকেরা বলেছেন যে, নতুন সৃষ্টির এই প্রসববেদনা হলো শিল্পস্রষ্টার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাম্যবাদী পর্যালোচকেরা বলেন যে, এই বেদনা শুধু ব্যক্তিগত নয়,—দেশগত, কালগত, ঐতিহাসিক ধারাগত। তাঁরা বলেন, পরিবর্তনই সৃষ্টির স্বভাব,—অর্থনৈতিক সম্পর্কও মানব-সমাজে পরিবর্তিত হচ্ছে,—ফলে, তথাকথিত 'স্থায়ী' ভাব ও রসের রাজ্যেও বিপ্লব ঘটছে—ফলে, এক যুগের 'বাস্তবতার' আদর্শ অন্য যুগের সমর্থন পাচ্ছে না। প্রত্যেক যুগের শিল্পাদর্শ সেই যুগের বিত্তচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিল্প এবং সাহিত্য আকাশ থেকে পড়ে না,—দেশের মাটি থেকে, যন্ত্র থেকে, মানুষের মন থেকে অঙ্কুরিত হয়। অতএব, সাহিত্যের বাস্তবতা একটা ধ্রুব পদার্থ নয়,—'বাস্তবতা' হলো নিত্যপরিবর্তমান মানবসমাজের নিত্যবিবর্তমান যুগচেতনা,—অর্থাৎ শিল্পীর সেই আত্মবোধ, যা আত্মস্বাতন্ত্র্য নয়,—যাকে বলা যায়, যুগসত্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ। এই তত্ত্বই নিহিত আছে তাঁদের পারিভাষিক সূত্রে—দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের (Dialectical Materialism) দৃষ্টিকোণে।* সাহিত্যে-শিল্পে 'বাস্তবতা'-র আলোচনা এই অবধি এসে দ্বি-ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য। যাঁরা বিতর্কবিজ্ঞ, তাঁরা এ-দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের

---

* At a certain stage of their development, the material forces of production in society come in conflict with the existing relations of production, or, what is but a legal expression for the same thing, with the property relations within which they had been at work before. From forms of development of the forces of production, these relations turn into their fetters. Then comes the period of social revolution. With the change of the economic foundation, the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed.—Karl Marx.

গ্রাহ্য, তা নিয়ে তর্ক জমিয়ে তুলতে পারেন,—যাঁদের ধৈর্য আছে, তাঁরা এই দুই স্রোতের মহাসঙ্গম পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন।

আমার তথ্যজ্ঞান সামান্য, স্বভাবটি নানাচারী, একনিষ্ঠা অনায়ত্তা। আমি এই যুক্তবেণীর তীর থেকে দূর সঙ্গমের ধ্যানটি একবার চিন্তা করি। রবীন্দ্রনাথ সেই ধ্যানের উদ্‌গাতা। কাব্যে 'বাস্তবতা'র উৎস এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে নিচের মন্তব্যে :

যে সত্য আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোন মূল্য নেই, সে হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা কিছু আমাদের সুখ দুঃখ বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা দীক্ষার, আমাদের স্বভাবের আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব ব'লে গ্রহণ করি, সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারো প্রশস্ত কারো সংকীর্ণ। কারো দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে বিশ্বের ছোটবড় অনেক কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ শক্তি।৭

এই ধ্যানে সাহিত্য-রসের ধ্রুববাদীদেরও আপত্তি নেই, পরিবর্তন-বিশ্বাসীদেরও অনাস্থার কারণ নেই। এই মান অনুসারে ফরাসী সাহিত্যের Goncourt-ভ্রাতৃবৃন্দের প্রচারিত 'বাস্তবতা' অ-গ্রাহ্য; কিন্তু মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল-ও বাস্তব, শোলোগভের উপন্যাসও বাস্তব,—আবার, সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'-ও বাস্তব সাহিত্য। সৃষ্টি চলমান, মানুষের মন স্থাণু নয়,—অতএব 'বাস্তবতা-ও একটি চলন্ত সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের অনেক কবিতায় এই ধারণাটিই ফুটে উঠেছে।

৭ বাংলা ভাষা পরিচয়

সাহিত্যে সংকেতভাষণ

সাঁওতাল পরগণার রুক্ষ রাঙা মাটির বন্ধুর রাস্তা দিয়ে হেঁটে নির্জন টিলার ওপর উঠে বসতেই বেলগাছের কাণ্ডটার দিকে চোখ পড়লো : দেখা গেল সারি সারি খোদাই করা প্রায় আধ ডজন বাঙ্গালী নাম। এই শূন্য মন্দিরহীন, দেবতাহীন, শস্যহীন টিলার ওপরেও যাত্রীসমাগম ঘটে থাকে! যাত্রীরা শুধু দেহাতি বেহারী কিংবা সাঁওতালী নয়,—অকৃত্রিম বাঙ্গালী শিল্পীর ভোঁতা ছুরির স্বাদেও পাহাড়ী বেলগাছটা বঞ্চিত হয়নি।

বছরে বছরে গাছের ছাল বদল হতে হতে আঁচড়গুলো ক্রমশঃ মসৃণ হয়ে উঠবে। হয়তো, কাঠঠোকরা আর কাঠবিড়ালীর ঠোঁটে-দাঁতে-নখে বিপর্যস্ত হয়েই সেগুলো পরিণত হবে কাঠের গুঁড়োয়,—ঝরে পড়বে কালো পাথরের বুকে, যেখানে দুরন্ত শীতের হাওয়া নিত্যই ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি,—প্রবীণা, লীলাময়ী প্রকৃতিই ওদের শেষ কৃত্যের ভার নেবেন।

মানুষের লিপির ইতিহাস অর্থহীন কতকগুলি রেখা রচনার প্রয়াসেই সুরু হয়েছিল। পাহাড়ের গায়ে আঁকা সেই সব আদিম রেখা বিচারের ভার পড়েছে একালের উত্তরাধিকারী মানব-সভ্যতার ওপর। বাঁ দিক থেকে ডাইনে,—ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওপর থেকে নিচু-তে, বৃত্তাকারে, বর্তুলাকারে যুগে যুগে মানুষের আত্ম-প্রকাশের ব্যাকুলতা অসীম যন্ত্রণায় কী অনিবার্য চাঞ্চল্যে কতো-যে বিচিত্র রেখাপাত করেছে, সেই তত্ত্বকথা হঠাৎ যেন অপূর্ব এক রসমূর্তিতে চেতনায় উদ্ভাসিত হলো। চোখের সামনে যে আধ-ডজন নামের কাঠ-খোদাই স্তব্ধ হয়ে আছে, তাদের ঐকান্তিক চাঞ্চল্য মেরুপ্রদেশের কঠিন জলতরঙ্গের মতো মনের মধ্যে হিমস্পর্শ ছড়িয়ে দিয়ে গেল!

যাঁরা পথে বেরিয়েছেন, তাঁরা সকলেই এমন সব স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত আছেন। তাজমহলের পাথরে, ফতেপুরশিক্রীর লাল দেয়ালে, কুতুবমিনারের সিঁড়িতে, জাহাঙ্গীরের কুখ্যাত গ্রন্থশালার কোণে-কোণে এমন কতো নাম আগাছার মতো ঋতুতে ঋতুতে জমে ওঠে, ওষধির মতো বছরের পর বছর টিঁকে থাকে।

এক মনের অভিজ্ঞতা থেকে বহু মনের বোধগম্যতার অভিমুখে আত্ম-

প্রকাশের স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পাথর বা ধাতুর ফলক দিয়ে,—চকখড়ি দিয়ে,—কালি-কলম, পিটুলি, তুলি-বুরুশ, হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই দিয়েই, মানুষ নিজের আকাংক্ষা আর অভিজ্ঞতার ছবি অন্য মানুষের জন্য তুলে রেখেছে। বাংলার কলমীলতা, শঙ্খলতা, খুন্তীলতার আলপনা,—আফ্রিকার, এবং মার্কিন মুলুকের 'টোটেম্' হলো এই সর্বজনীন প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। ক্রীট, মিশর, গ্রীস,—দুনিয়ার প্রাচীন আলোকস্তম্ভের মতো স্মৃতির সীমাহীন ধূসরতায় এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে-সব দেশ, শঙ্খলতার মণ্ডন সে-সব দেশের শিল্পক্ষেত্রে এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাংলার নিভৃত শান্তিলোকে,—যশোরের মেয়েদের হাতেই এই শঙ্খলতার রূপকল্প প্রথম লতিয়ে উঠেছিল। হয়তো বাংলার প্রসিদ্ধ ঢাকাই শাড়ীর পাড়ে লুকিয়েই সেই লতা কোনো সময়ে প্রাচীন গ্রীসে-মিশরে চালান গিয়ে থাকবে। প্রথম যে-মনে এই প্রকাশের প্রেরণাটি জেগেছিল, হাতের শাঁখা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, পুকুরের কলমীলতার বনে উদাস, বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি মেলে রেখে, ঘরকন্নার প্রত্যক্ষ ঝামেলার ফাঁকে-ফাঁকে শাশুড়ী-ননদের-প্রিয়জন-গুরুজনের ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে প্রথম যে-মেয়েটি মনে মনে এই লীলা উপভোগ করে গেছে,—অনাবশ্যক আঁচড় কেটেছে ঘাটের পৈঠায়, আঙিনার মাটিতে,—সময়ের সম্মার্জনী তাকে অতি স্বাভাবিক দায়িত্ববোধেই চুপি চুপি বিদায় দিয়েছে। ইতিহাসে তার নাম নেই, পূর্ববঙ্গগীতিকার কোনো প্রত্যন্ত কোণেও সেই অন্তঃপুরিকার স্নান-প্রসাধনের সৌরভ সঞ্চিত নেই। কারণ, তার অপটু আঁচড়ের মূলে প্রেরণা ছিল বটে, কিন্তু সে প্রেরণা তখনো শিল্পীর আত্মপ্রকাশের শিল্পকলা আয়ত্ত করেনি। তারপর, বাংলার কতো বৌ-ঝির কতো চাঁপাকলি আঙুলের যাদুতে সেই আঁচড় হলো আলপনা,—কাকলী হলো ভাষা।

ভাষা ভাবনার বাহন। বাহন এবং আরোহীর দাম এক নয়,—কোনো হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্রের রাজ্যেও অশ্ব এবং অশ্বারোহীকে সমমর্যাদার অধিকারী বলে স্বীকার করা হয় না। অবশ্য, অশ্বের গুণে অশ্বারোহীর সম্মান কম-বেশি হতে পারে। ভাষার ক্ষেত্রেও কতকটা সেইরকম। তবে, ভাষার ঘোড়ায় ভাবনা যখন আরোহী হয়, এই 'সাদৃশ্য'-টি তখন পুরোপুরি খাটে না। কারণ, প্রকৃত ভাবুকের ভাষা হলো,—তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দ-প্রণোদিত সংকেত,—

সেক্ষেত্রে, আরোহী তাঁর যোগ্য বাহনটি স্বতঃই বেছে নিয়ে থাকেন। আরোহীর গলায় ঝোলানো তক্‌মারে জোরে, অথবা, মাথায় ওড়ানো উষ্ণীশের ভয়ে ঘোড়া তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায় না,—ভাবুকের ভাবনার বন্যায় ঠিক ভাষাটিতে ঠিকভাবে টান পড়ে। ভাষা মাত্রেই সংকেত। সাধারণ লোকাচারের ভাষা বহুপ্রচলনের ফলে আমাদের কাছে জলবৎ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শিল্প-সাহিত্যের ভাষা সব ক্ষেত্রে তেমন হয়নি ;— সে হলো তির্যকতর সংকেত।

পরিণত শিল্পপদ্ধতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, গহন সংবেদনের সঙ্গে তদনুকূল প্রকাশরীতির ওতঃপ্রোত যোগ এই সব পথে স্বতঃই সাধিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে,—শব্দার্থের এই 'সাহিত্য-সাধন' বা কাব্য-রসায়ন বা কবিকৃতির রহস্যটি কি ? Wordsworth-কথিত বহুশ্রুত 'emotion recollected in tranquillity'-র সূত্রে শিল্পসৃষ্টির রহস্য-ব্যাখ্যান যদিচ প্রশস্ত, তথাপি, কাব্যের সর্বসংজ্ঞা-পরাজয়ী আনন্দস্বরূপের কথা স্মরণ করে কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি দীর্ঘস্বীকৃত এই সংজ্ঞাতেও আপত্তি তুলেছেন। এই রকম এক প্রতিবাদী বলেছেন :

It will not do to talk of 'emotion recollected in tranquillity', which is only one poet's account of his recollection of his own methods ; or to call it 'criticism of life', than which no phrase can sound more frigid to anyone who has felt the full surprise and elevation of a new experience of poetry.*

কবি ও পর্যালোচক এলিয়ট্ সাহেবের এই মন্তব্যই এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট। বার্ডসার্থ এবং ম্যাথ্যু আর্নল্ড—উভয়ের উক্তি সম্পর্কেই তাঁর কটাক্ষ সমান তীক্ষ্ণ। কবির যে-অভিজ্ঞতা থেকে কাব্যের জন্ম হয়, কেবলমাত্র সেই উৎসের বিশ্লেষণেই কাব্যের রহস্যোদ্ধার করা সম্ভব নয়,—এই হলো তাঁর সিদ্ধান্ত। কাব্য কবির ইন্দ্রিয়বোধ ও মননের লালনে, স্মৃতি ও শ্রুতির পরিচারণে বিকশিত হয় বটে,—কিন্তু কাব্যরহস্য এইসব উপাদানের যোগফলের সমান নয়। অর্থাৎ, কোনো ক্ষেত্রেই কাব্যবিশেষের আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাবের

* The Sacred Wood ; T. S. Eliot

চৌহদ্দীর মধ্যে কাব্যরহস্যকে বেঁধে রাখা যায় না,—গঙ্গোত্রীর বর্ণনায় গঙ্গার স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়,—এই হলো এলিয়টের অভিমত।

ক্রোচে বলেছেন, এ হলো আবেগের যন্ত্রণা থেকে ধ্যানের স্থৈর্যমুখে অভিযান। বাংলায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বহুমান্য বিদগ্ধজনের অভিমত তুলে দেখিয়েছেন যে, সেই প্রদেশেও এই মূলসূত্রে সম্বন্ধে মতানৈক্য নেই। Wordsworth-ও একই কথা বলতে চেয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, Eliot-সাহেব Wordsworth এবং Matthew Arnold-প্রদত্ত পৃথক পৃথক সূত্রের বিরোধিতা করেও সেই একই কথা বলতে চেয়েছেন,—বলতে চেয়েছেন যে, কবিকৃতি রহস্যময়ী,—'কবিরে পাবেনা তাহার জীবন-চরিতে'। Fancy এবং Imagination-এর পার্থক্য স্বীকার করে Imagination-এর যে-কৌলীন্য সে-যুগে Coleridge-এর লেখায় ঘোষিত হয়েছিল, সে-কৌলীন্যের হেতু সন্ধান করলেই পূর্ব মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। পরস্পর-সংপৃক্ত বাগর্থের অর্ধনারীশ্বর-কল্পনায় কালিদাস সেই অলৌকিক শক্তির—'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞার-'ই ইঙ্গিত করে গেছেন। আবার একাদশ শতকের 'বক্রোক্তি'বাদী কুন্তক 'শব্দার্থ-সাহিত্যের' প্রসঙ্গে 'বিদগ্ধভঙ্গীভণিতি' কথাটি ব্যবহার করে কবির সেই চিররহস্যময়ী চমৎকারী শক্তিরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রাচীন গ্রীক মনীষীরা Esemplasis-তত্ত্বের সূত্রে-ভাষ্যে তারই বন্দনা লিখে গেছেন।

উনিশ শতকে ফ্রান্সে প্রতীকী-আন্দোলনের (symbolist movement) যখন সূত্রপাত হয়, তখন থেকে কবি-কর্মের সাধনায় চির-উহ্য অথচ চিরস্বীকৃত বোধগম্যতার লক্ষ্য অস্বীকার করে কাব্যে কবির আত্মগত সংবেদনের প্রক্ষেপন-অভিপ্রায়ে এক শ্রেণীর লেখক বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে রোমান্টিক কাব্যের 'ভোরের পাখী' ছিলেন কবি ব্লেক,—আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেমন বিহারীলাল চক্রবর্তী। ব্লেক বলেছিলেন—

May God us keep
From single vision and Newton's sleep.

মনের বুদ্ধিজাগর অবস্থার জন্য বৈজ্ঞানিক নিউটনকে দোষ দেওয়াটা অবিশ্যি সঙ্গত নয়। তার কারণ, Newton-এর অভিপ্রেত ক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতার দ্বারা বেষ্টনীবদ্ধ। তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে

কার্যকারণাত্মক বস্তুজগতের বাইরে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্যের অভিসারে যেতে চান নি। তিনি যে-দৃষ্টির প্রসাদ পেয়েছিলেন, সে হলো 'দ্বৈত-দর্শন'।

For double the vision my eyes do see,
And a double vision is always with me.

ব্লেকের এই 'দ্বৈত-দর্শনে'র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিদগ্ধ এক সমালোচক লিখেছেন যে, তাঁর কাছে 'spiritual attitude is more real than thought.'; অর্থাৎ, কার্যকারণদর্শী বুদ্ধির চেয়ে আত্মিক উপলব্ধিতে তাঁর আস্থা বেশি ছিলো।

রসিক-সাধারণের বোধগম্য শিল্পক্ষেত্রে, সাধারণতঃ এই atittude ও thought, মেজাজ ও মননের রাসায়নিক যোগ সাধিত হয়ে থাকে। কবির অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সর্বসাধারণের অর্থাৎ বিদগ্ধ-সাধারণের পরিচিত ঐন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উল্লেখ-সূত্রেই ধ্বনিত হয়ে থাকে। কিন্তু ব্লেক এই রকম সিঁড়ি ভেঙ্গে তাঁর পাঠকের কাছে পৌছতে, হয়তো, রাজী ছিলেন না। ব্লেক চেয়েছিলেন মেজাজের প্রাধান্য। ফরাসী সাহিত্যের প্রতীকী-আন্দোলনেও এই বুদ্ধি-নিরপেক্ষ মেজাজের উপাসনাই ঘটেছে। মনের নিভৃত, গহন, ব্যক্তিগত সংবেদনার প্রত্যক্ষ প্রক্ষেপনেই এই প্রতীকবাদীদের লক্ষ্য ছিলো। এবং এই সূত্রে একথাও মনে পড়া স্বাভাবিক যে, প্লটিনাস, বের্গসঁ প্রভৃতি দার্শনিকরাও বুদ্ধিকে স্বজ্ঞা বা intuition-এর অধীনতায় রাখতে উৎসাহী ছিলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে Zurich-এ আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এক সভায় Dadaism নামে যে নব্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সমাজতত্ত্ববিদ্ সাহিত্যালোচকেরা বলেছেন যে, সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকায় সে হলো ধনতান্ত্রিকতার প্রতিবাদ; আর, শিল্প-ক্ষেত্রে সে হলো অচেতন-অবচেতনের অভিষেক। বুদ্ধির সর্বময় নেতৃত্ব অস্বীকার করে শিল্পিমানসকে এঁরা অচেতন-অবচেতন লোকের সূক্ষ্ম উপলব্ধির প্রবাহক্ষেত্র রূপেই গ্রহণ করলেন। তারপর ফ্রয়েডীয় মনোবিচার প্রচারিত হবার পরে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিসে 'সুর-রিয়্যালিজমে'র নববোধন শোনা গেল।

য়ুরোপে নবযুগের গদ্য-লেখক জেমস্ জয়েস্ Zurich-এ এবং Paris-এ বহুদিন বাস করেছিলেন। 'সুর্-রিয়্যালিজমের' হাওয়া লেগেছিল তাঁর মানস-কুঞ্জে, ফলে 'ইউলিসিস্' এর জন্ম হয়। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Virginia Woolf, কবিদের মধ্যে T. S. Eliot একদা এই একই দৃষ্টির প্রভাব মেনে

নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জয়েসের গদ্যরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট সাহেব Newman ও Walter Pater-এর প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া জয়েসের অবশ্য অন্যত্রও ঋণ ছিল। তিনি ছিলেন 'সংকেত'-ভাষী।

জয়েস্ গদ্যের ক্ষেত্রে প্রধান যে-জিনিসটি আনলেন, সেই 'সংকেতভাষণে'র উৎস কোথায়? জীবনের ঘৃণিত বাস্তব চিত্র পরিবেশনের অভিযানে সমসাময়িক গুণিজনের ভাষণে তিনি তিরস্কৃত হয়েছেন। বার্নাড শ' তাঁর বইখানা আগুনে আহুতি দিয়েছিলেন। ডি-এচ-লরেন্স সে-বই সম্পর্কে যে সব কথা বলে গেছেন তার মধ্যে সব চেয়ে মোলায়েম অংশ হলো: James Joyce bores me stiff.।

স্বতঃস্ফূর্ত কথার এলোমেলো আঁচড়কে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করবার আস্ফালন জেম্স্ জয়েসের অভিনব রীতিতে মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল। জয়েস্ নিজে বলে গেছেন যে, Edward Dujardin নামে এক প্রতীকবাদী ফরাসী লেখকের লেখা একটি ছোট উপন্যাস থেকেই তাঁর পক্ষে এই জাতীয় সংকেতভাষণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। দুজাদ্যাঁ তাঁর প্রবর্তিত এই অন্তর্মুখী রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ও হলো internal monologue-এর সমধর্মী। বিশদভাবে ব্যাকরণের শাসন মানা ওখানে অসম্ভব।

বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রীতি নতুন জিনিষ নয়। ডস্টয়েভস্কীর রচনায় আঁদ্রে জীদ্ এমন দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন। পূর্ববর্তী ইংরেজি সাহিত্যেও এ-জিনিষ একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। 'সুর-রিয়্যালিজমের' প্রবর্তকদের কাছে শোনা গেছে যে, স্মৃতির উৎপাতমুক্ত শিল্পিমানসের অব্যবহিত প্রক্ষেপনই ছিল তাঁদের কাম্য এবং উপাস্য,—সাধ্য এবং লক্ষ্য। জেমস্ জয়েস্ তাইই করে গেছেন। তাঁর রচনা হলো: 'immense geographies of dream and desire'।

এই জাতীয় 'আঁচড়ের' মূলে কবির মনের যে চিন্তাবিমুখ লীলাপ্রবণতা অভিব্যক্তি কামনা করে, তার কৃতিত্ব-সম্ভাবনায় আস্থা রাখতে আপত্তি নেই। কিন্তু কেবল চিন্তাবর্জিত অনুভূতি কোনো অবস্থাতেই শিল্পীর সার্থকতার একমাত্র সর্ত হতে পারে না। অর্থহীন আঁচড় অন্তরের খেয়ালে উৎসারিত হয়,—পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার জন্ম তা মাথা ঘামায় না। 'সুর-রিয়্যালিজম্' আর 'সন্ধ্যা ভাষা'—এ দুই পদার্থই হলো অর্থব্যাখ্যানকুণ্ঠ;—আঁচড়েরই রকমফের। এবং সেই কারণে সাধারণ রসগ্রাহীর কাছে এই দুই পদার্থ আজও দুর্বোধ্য। রস-পরিবেশনের কাজে পাত্র অনুচিত হলে

রসও অপচিত হয়, অর্থাৎ শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবের শিল্পোচিত, সার্থক 'সাধারণীকরণ' তখন আর সাধ্য হয় না।

রাজানক কুন্তক বলেছিলেন 'বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম্'। তির্যক ভাষণেই শিল্পীর প্রকৃত কৌশল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য, যে অতি-স্পষ্টতা যেমন অতি-বাস্তব,—অতি-তির্যকতা তেমনি অতি-অবাস্তব। 'বক্রোক্তি' হলো এই দুই-এর মধ্যগা। কুন্তক তাঁর প্রবর্তিত বক্রোক্তিবাদের ব্যাখ্যানে পর্যায়ক্রমে ভঙ্গী-ভণিতি, বৈচিত্র্য, বিচ্ছিত্তি, বক্রত্ব ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে বলেছিলেন যে, 'বক্রোক্তি' মানে বাক্‌চাতুর্য নয়,—বক্রোক্তি হলো কবি-কল্পনার সামগ্রিক প্রকাশ। শব্দ এবং অর্থের অদ্বৈত-সত্তা কবিকল্পনার লালনে যে-উক্তির মধ্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠে সহৃদয় বিদগ্ধজনের মনে লোকোত্তর-চমৎকারী অনুভূতি সৃষ্টি করে, তারই নাম বক্রোক্তি। অতএব, যে-আঁচড় বিদগ্ধচিত্তে আনন্দ সৃষ্টি করে না, সে-আঁচড় আর যাই হোক, সাহিত্যে বা শিল্পলোকে বরণীয় নয়। আবার, যে-কথা স্পষ্ট অর্থবহ হলেও বেগহীন, বর্ণহীন, ব্যঞ্জনাহীন,—লোক-প্রচলন আর অভিধানের দ্বারা সমর্থিত হলেও শিল্পবিচারে সে কথা শুধু আঁচড়-ই। একদিকে পদ্যপাঠের পদ্য এবং অন্যদিকে বহুনিন্দিত আধুনিক কাব্যের 'হিং টিং ছট্' এই দুই জিনিসই আঁচড়, প্রথমটি অর্থসম্পন্ন এবং দ্বিতীয়টি অর্থহীন।

কবিতায় অস্পষ্টতা

আনন্দবর্দ্ধন বলে গেছেন—সর্ববিদ্যার মূলে আছে ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ হলো শব্দব্যুৎপত্তি-শাস্ত্র। শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভাষার নিয়ম, পদ-সাধনের পদ্ধতি, পদান্বয়ের প্রক্রিয়া—এইসব আয়ত্ত না হলে কোনো বিদ্যাতেই প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না! আধুনিক ভাষায় 'ব্যাকরণ'-কথাটির অর্থ-প্রসার ঘটেছে,—একালে ব্যাকরণের মধ্যে উচ্চারণ-শাস্ত্র (সংস্কৃতের 'শিক্ষাশাস্ত্র'), ছন্দোশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি ঢুকে পড়েছে। আনন্দবর্দ্ধন বোধহয় এতোসব শাস্ত্রের কথা মনে রেখে ও-কথা বলেন নি। তিনি হয়তো এই বলতে চেয়েছিলেন যে, শব্দের বাহনে যাঁদের চলাফেরা করতে হয়,—শব্দের আইন তাঁদের জানা দরকার। কথাটি এতোই সঙ্গত যে, মনে হয়, ও-কথা আবার ঘটা করে বলবার কি দরকার ছিল!

আনন্দবর্দ্ধনের সময়ে ও-কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করবার কী-যে দরকার ছিল, জানিনা। তবে, আমাদের কালে ভাষায় এবং জীবনে স্বতঃসিদ্ধের মতো এই সহজ কথাটি লাখ কথার এক কথা বলে মনে হয়। কারণ, এ-যুগে চিরাভ্যস্ত জীবনের ব্যাকরণেও যেমন গোল বেঁধেছে, ভাষার ব্যাকরণেও তেমনি শৈথিল্য ঢুকেছে। আর, ভাষার রাজ্যে সবচেয়ে যাঁরা বেশি অরাজকতার লক্ষণ দেখাচ্ছেন, তাঁরা বৈজ্ঞানিক নন, দার্শনিক নন, ঐতিহাসিক নন, সাধারণ মানুষও নন,—তাঁরা হলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যরচয়িতা। অভ্যস্ত ব্যাকরণের যাঁরা বিরোধিতা করেন, কবিপ্রসিদ্ধির চিরাভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া উৎপাদনে যাঁদের ঝোঁক নেই, শব্দের সুপরিচিত স্বাদে যাঁদের আগ্রহ অল্প—সেইসব 'অনাচারী'র দল চান কি? তাঁরা কি বুদ্ধিহীন? পাঠকের এবং শ্রোতার আশু-অনাগ্রহ এবং ক্রমলভ্য বিস্মৃতি-ই কি তাঁদের কাম্য? ব্যাপারটি তলিয়ে দেখা দরকার। কারণ, এই দলে যাঁরা নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও সৎ লেখকের অভাব নেই, শাস্ত্রজ্ঞ অনেক আছেন,—'অন্যে পরে কা কথা',—আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেচে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। (আধুনিক কবিতা : রবীন্দ্রনাথ)

সব মানুষের স্বভাব এক নয়। মনের সংস্কার, প্রাণের আশা, জীবনের প্রয়োজন—এইসব ব্যাপারে মানুষে-মানুষে ভেদ থাকার ফলে বিভিন্ন মানুষের আত্মপ্রকাশেরও ভেদ ঘটে থাকে। তবু, পরস্পরের মেলামেশার সুবিধার জন্য ভেদগুলো যথাসম্ভব দাবিয়ে রেখে এক-একটি ভাষার মিলন-মণ্ডপে সর্বজনীন এক-একটি আশ্রয় গড়ে তুলতে হয়। সংসারের নিত্য-প্রয়োজনের ভাষায় তাই দেখা যায় সর্বজনীনত্ব। জীবনের সাধারণ দাবীর ভাষা স্পষ্ট,—বিজ্ঞানের ভাষা সতর্ক,—বণিকের ভাষা বিনীত, কিন্তু বিনয়ে বেহুঁস নয়,—দর্শনের ভাষা শ্রমবোধ্য,—ইতিহাসের ভাষা সরল, কদাচ অলংকৃত;—কিন্তু কাব্যের ভাষা রমণীয় এবং অস্পষ্ট। অস্পষ্টতা কবিতার কলঙ্ক! অস্পষ্টতাই কাব্যের জ্যোৎস্না!

কাব্যের অস্পষ্টতার নানা কারণ। অস্পষ্টতা কখনো হয় শব্দগত, কখনো অন্বয়গত, কখনো অলংকারগত, কখনো আবার কবির উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যগত। মধুসূদন দত্ত একবার বলেন 'দম্ভোলি', আবার বলেন, 'ইরম্মদ'—কিন্তু সাধারণ

বাঙ্গালীর কাছে সুপরিচিত 'বাজ' শব্দটা তিনি এড়িয়ে চলেন; বেহুলার সঙ্গে রসিকতা করে ভবানীর কাছে বকুনি খেয়ে নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' শিব বলেছেন, 'নাতি বৌহারি জানি চব্বুট করিলাম আমি,' অর্থাৎ নাতবৌ-এর সঙ্গে ঠাট্টা করেছি—তাতে আবার দোষ হলো কোথায়? সে কালে নিশ্চয় 'চব্বুট' কথাটা চলতি ছিলো—কিন্তু একালের বহু পাঠকের আগ্রহ 'চব্বুটে'র ধাক্কায় হিম হয়ে যায়। এ রকম ভাষা অলস লোকের কাছে অস্পষ্ট বটে, কিন্তু, অভিধান খুলে দেখলেই ধোঁয়া কেটে যায়। প্রকৃত শব্দগত অস্পষ্টতা ঘটে সেইখানে—যেখানে শব্দটি হয় দেখা যায় পুরোপুরি অভিধান-বহির্ভূত,—নয়তো ব্যবহারকর্তার উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দটির ঔচিত্যের যোগ ব্যবহারকর্তা ছাড়া আর কারও কাছেই যেখানে সুপ্রকাশিত নয়। পুরোপুরি অভিধান-বহির্ভূত শব্দের দৃষ্টান্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ; 'গল্পসল্পে'র বাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত কথাটি হলো—'পেডেণ্ডা',—সরস ভাবে পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও গাম্ভীর্য ব্যক্ত করতে যার জুড়ি মেলে না। বনফুলের 'জঙ্গমে' আছে 'লদকালদকি' ইত্যাদি শব্দ। এসব শব্দ এখনো অভিধানে ওঠেনি বটে, —কিন্তু বই থেকে মানুষের মুখে যদি এরা জায়গা পায়, তাহলে আরো অনেক বইয়ে ওদের ফিরে-ফিরে পাওয়া যাবে;—এবং ক্রমশঃ অভিধানেও ওদের জায়গা হয়ে যাবে। তখন আর এসব শব্দ অস্পষ্ট থাকবে না। কবিতায় শব্দগত অস্পষ্টতা এছাড়া আরও এক কারণে ঘটে থাকে,—বাংলায় যেমন ঘটেছে বিষ্ণু দে-র কাব্যে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সে কারণটি খুলে বলেছেন: 'বিষ্ণু দে-র শব্দনির্বাচন যে-পরিমাণ অনুষঙ্গবাহী, সে অনুপাতে অভিধানসম্মত নয়'।

তারপর আছে—অন্বয়গত এবং অলংকারগত অস্পষ্টতা। গদ্যে বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত পদ নিজেদের পারম্পর্যের বিধি যথারীতি মেনে চলে। তবে, বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে এদের একটু-আধটু ঠাঁই বদল ঘটে থাকে। বাংলায় ক্রিয়াপদের প্রতিষ্ঠিত জায়গাটির দাবী রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই তাঁর অনেক বাক্যে উপেক্ষা করেছেন। ক্রিয়াপদের বাক্যান্তিক অবস্থান না-মেনে বাংলা গদ্যকে তিনি একঘেয়েমির জড়তা থেকে বাঁচিয়েছেন। গদ্যে এরকম একটু-আধটু রদবদল চলে বটে,—কিন্তু বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের ব্যাকরণসম্মত পারম্পর্য সেখানে অধিক মাত্রায় উপেক্ষা করা চলে না। এ-রকম উপেক্ষা

তিরস্কারের বস্তু। দূরান্বয় একটি দোষ। কবিতায় দূরান্বয়ের দোষ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। তাই কবিতার অন্বয় বোঝবার জন্য পাঠক স্বভাবতঃই গদ্যের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। দূরান্বয়ের সঙ্গে কষ্টকল্পনা-দোষটিরও উল্লেখ করা দরকার। ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রের strained metaphor, mixed metaphor একই পর্যায়ের দোষ। তবে, অধ্যবসায়ী পাঠক এসব বাধাও কাটিয়ে উঠতে পারেন। Milton-এর কাব্যও শ্রমপাঠ্য, মধুসূদনের কাব্যও তাই—তথাপি এঁদের ভক্ত পাঠক-সংখ্যা অল্প নয়।

কবিতায় অন্ধকারতম অস্পষ্টতার জন্মভূমি অন্যত্র। সে হলো কবির উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যে আশ্রিত। কবির অভিনব কোনো ভাবনার সঙ্গে কবিতার চিরাভ্যস্ত ভাষার সার্থক সমীকরণ না ঘটলেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাগার্থ আর যাথার্থ্যের সম্পূর্ণ সমীকরণ অসাধ্য' ;—সে কথা মানতেই হয়। কিন্তু গণিতের হিসেবে নয়, রসনিষ্পত্তির হিসেবে ধরলে 'সম্পূর্ণ সমীকরণে' আপত্তি ওঠবার কথা নয়। 'সম্পূর্ণ সমীকরণে' না হোক্, তার বদলে 'সার্থক সমীকরণের' আবশ্যিকতায় বোধ হয় কেউই আপত্তি তুলবেন না? সম্পূর্ণতা রসের দিক দিয়ে,—গাণিতিক বুদ্ধির জরীপে নয়। সার্থকতা মানেই সম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণতা মানেই সার্থকতা।

আধুনিক কালে যে-সব জ্ঞাণী-গুণী লেখক কাব্যের ভাষায় 'সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে' চলছেন না,—তাঁদের চেষ্টাও এই 'সার্থক সমীকরণ' ঘটানোর দিকে। অতীতে যে ভাষায় 'সমীকরণ সম্ভব হয়েছে, একালের নতুন মর্জি (attitude) সে-পোষাকে আর ধরা দিচ্ছে না। পুরনো আমলের পাঠ-নেওয়া পাঠক অনভ্যাসের জন্যে একালের নতুন পোষাককে রুচিসম্মত বলে ভাবতে পারছেন না। কেউ বলছেন এ-পোষাক উন্মাদের,—কেউ বা বলছেন এ সজ্জা অক্ষমের! অবিশ্যি উন্মত্ততা বিরল নয়, অক্ষমতাও সম্ভব। কিন্তু অক্ষমতা লেখকেরও একচেটিয়া নয়, পাঠকেরও সর্বাঙ্গীন নয়। দুটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

এধারে যাহার মাটির দম্ভ ওধারে মাটির মায়া
পদতলে যার অশ্রুর মত জল,
সে সেতু নহেক, বিবাহ দেয়নি এপারে ওপারে ভাই;
রাখিবন্ধন নহে শুধু শৃঙ্খল; [প্রথমা: প্রেমেন্দ্র মিত্র]

তবুও হংসীই আভা ; হয়তো বা পতঞ্জলি জানে।
সোনায় নিটোল করা ডিম তার বিমর্ষ প্রসব।

[পরিচায়ক : জীবনানন্দ দাশ,মহাপৃথিবী]

এই দু'টি দৃষ্টান্তে শব্দগত অস্পষ্টতা আদৌ নেই,—অন্বয়ের গোলমালও অনুপস্থিত,—পাঠকের কান ধ্বনিতে তৃপ্ত হয়, মন ঠিক-না-বোঝা এক-একরকম স্বাদে তুষ্ট হয়—তথাচ মনের মধ্যেই জিজ্ঞাসা ওঠে:—প্রেমেন্দ্র কোন্ সেতুর কথা বলছেন ? পতঞ্জলির সঙ্গে জীবনানন্দের আভাময়ী হংসীরই বা সম্পর্কটা কি ?

শব্দের আছে তিন শক্তি—অভিধা-শক্তি হলো সেই শক্তি যার গুণে শব্দবিশেষের অভিধানগত অর্থটি মনে পড়ে,—তাৎপর্য-শক্তির গুণে বাক্যে অবস্থিত বা পরস্পর-সংলগ্ন শব্দমালার পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝা যায়,—আর, শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থের পরিবর্তে তৎসম্পর্কিত অন্য অর্থের উদ্রেক করে যে শক্তি, তারই নাম লক্ষণা-শক্তি। অভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্যকে অতিক্রম করে রচনার যে-গুণ এই এই তিনের অতিশায়ী চতুর্থ এক অর্থে শ্রোতা বা পাঠকের মনকে স্পৃষ্ট করে, তারই নাম ব্যঞ্জনাশক্তি। ব্যঞ্জনাই মহৎ কাব্যের লক্ষ্য। এ-রাজ্য বৈয়াকরণের তদারকির বাইরের এলাকা। ওপরের দু'টি দৃষ্টান্তেই কবিরা এই রাজ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। কিন্তু পথে কিছু বাধা পড়েছে,—দেখা দিয়েছে অস্পষ্টতা। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে বাধা সামান্য,—কবিতাটির শেষ অবধি পৌঁছে শোনা যায়—'সেতু সে ব্যর্থতার'। তখন আর মনে বিশেষ অস্বস্তি থাকে না। শেষের দৃষ্টান্তটি হলো উদ্ভট মননের পরাকাষ্ঠা। যে-অর্থে Browning-এর অনেক কবিতা অস্পষ্ট, যে-অর্থে সপ্তদশ শতকের ইংরেজি অধ্যাত্ম-কাব্য (metaphysical poetry) দুর্বোধ্য,—জীবনানন্দের এই দুটি চরণ সে-অর্থে অস্পষ্ট নয়। এ অস্পষ্টতার কারণ—কবির একান্ত আত্মমগ্নতা ! একেই বলে 'অন্তর্মুখী স্বগতোক্তি'—internal monologue। অর্থাৎ, অপরের বোধগম্য করবার জন্য ব্যাকরণাতীত যে ব্যাকরণের কাছে কবির বশ্যতা শাশ্বত,—জীবনানন্দ এই কবিতায় সেই বশ্যতাই উপেক্ষা করেছেন। ফলে, তাঁর এই কবিতায় নতুনত্ব ফুটেছে, কিন্তু শ্রী ফোটেনি,—অস্পষ্টতা ঘটেছে কিন্তু কাব্য ঘটেনি।

সাহিত্যিক প্রয়োজনে এবং আদর্শে বাংলায় গদ্যের অনুশীলন আরম্ভ হলো উনিশ শতকের প্রথমেই। লিখিত মূর্তিতে তার পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তা নয়। বৈষ্ণব তত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি পুঁথিতে, বিদেশে রোমক লিপিতে মুদ্রিত এক খ্রীষ্টান যাজকের একটি বইয়ে, প্রাচীন কয়েকখানি চিঠিপত্রে এবং কোনো কোনো দলিল-দস্তাবেজে অতীত কালের বাংলা গদ্যের নমুনা সংরক্ষিত আছে। সেইসব নমুনা দেখে গবেষণার স্পৃহা মেটে বটে, কিন্তু সাহিত্যরসের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না। কারণ, সাহিত্য প্রণয়নের প্রেরণায় সেইসব রচনার সৃষ্টি হয়নি।

উনিশ শতকের আগে সাহিত্যের প্রশস্ত বাহন হিসেবে পদ্যই এদেশে প্রধানতম মর্যাদা লাভ করেছে। বাঙালী সাহিত্যিকের মননের সমস্ত সম্পদ পদ্যবাহনেই প্রকাশ কামনা করে এসেছে। বৈষয়িকতার স্থূল মাটিতে ঐরাবতের মতো এগিয়ে গিয়েছে বাংলা পদ্য,—আবার, দরকার মতো, স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দেবার প্রযত্নে পারাবতের মতো শূন্যলোকে ভেসে গিয়েছে সেই একই বাংলা পদ্য। চর্যাগীতি রচনার সময় থেকে খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতক অবধি বাংলায় একা পদ্যই এই দুই পৃথক বাহনের পৃথক পৃথক দায়িত্ব বহন করে এসেছে। এই পৃথক পৃথক দায়িত্বের পার্থক্য যে কতো প্রসারিত, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে শ্রীচৈতন্যের অল্প পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে,—যখন একদিকে গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি কবিরা পদাবলী লিখছিলেন—এবং অন্যদিকে তাঁদেরই নিকটসাময়িক বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পণ্ডিতরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা এবং বৈষ্ণব তত্ত্বপ্রসঙ্গ বর্ণনা করছিলেন বহু শ্রমনিষ্ঠ, বহু ভারসহ, স্থিতিস্থাপক বাংলা পয়ারে। পদ্যবাহনের এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যতম স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

বিদেশী শাসক ও যাজক সম্প্রদায়ের স্বার্থের তাগিদেই গদ্যের সাধনা এদেশে ব্যাপক অধিকার বিস্তারে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের নীতিকথাগুলি বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বাসনায় খ্রীষ্টান যাজক আকৃষ্ট হলেন বাংলাভাষার প্রতি। দেশের শাসনযন্ত্রটির মসৃণতা

অব্যাহত রাখবার তাগিদে দেশের ভাষা আয়ত্ত করবার যৌক্তিকতা যে অকাট্য, —বিদেশী শাসকদের অন্তরেও সে কথা যথাসময়ে অধিগম্য হলো। ইচ্ছা থেকেই উপায় দেখা দেয়। ফলে, প্রাক্তন বাংলা সাহিত্যের পদ্যসর্বস্বতা এঁদের চোখে পড়লো। এবং, অবিলম্বে সেই দৈন্য ঘুচিয়ে দেবার সাধনাও সুরু হয়ে গেল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরের বছর,—১৮০১-এর এপ্রিল মাসে উইলিয়ম কেরি সেই কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। বাংলা গদ্যে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হয়ে গেল। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ কেরি সাহেবের তত্ত্বাবধানে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপিত হলো।

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাচীন বহু গ্রন্থনামে 'প্রবন্ধ' কথাটির প্রযোগ দেখা যায়। কিন্তু বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দটি প্রধানতঃ গদ্যবাহিত যে তত্ত্বালোচনামূলক রচনাশ্রেণী নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যার্থ নিরপেক্ষভাবে 'প্রবন্ধ' শব্দের সে রকম ব্যবহার নেই। সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' প্রকৃষ্ট বন্ধনের রূপগত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেও গদ্যরীতিকে তার একমাত্র অবিচ্ছেদ্য বাহন হিসেবে গ্রহণ করেনি। সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' গদ্যে-পদ্যে উভয় বাহনেই লেখা হয়েছে। তা'ছাড়া সেখানে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' ছিল নানা অর্থসূচক অভিধা; —ছন্দের বন্ধন, বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, সর্গ-অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনাক্রমের পারম্পর্য ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ'-শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাহিত্য দর্পণে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যের রচনা-বৈশিষ্ট্যের ও গ্রন্থন-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গেও 'প্রবন্ধ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্য-নাটকাদির বিভিন্ন উপাদানগত আবশ্যিক সঙ্গতির নামও 'প্রবন্ধ'। তা থেকে 'প্রবন্ধৌচিত্য' কথাটি সংস্কৃতে বহু আলোচিত হয়েছে,—কুন্তক বলে গেছেন 'প্রবন্ধবক্রতা'র চারুকৃতি-কথা। এইসব বিচিত্র প্রয়োগে সংস্কৃত 'প্রবন্ধ' আর ইংরেজি 'Essay' পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে প্রযুক্ত হয়নি। Aristotle যাকে বলেছিলেন শিল্পবস্তুর আভ্যন্তরীণ ঐক্য বা Unity, সংস্কৃতের অলঙ্কার শাস্ত্রে 'প্রবন্ধ' অনেকটা সেই অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। এ সম্পর্কে সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থপ্রণেতাদের মনোভাবটি সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত,—

সকল জুড়িয়া একটা বিশেষ প্রবাহ বা পরিণতিই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।*

কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর বলেছেন 'অনুজ্ঝিতার্থ সম্বন্ধত্বই' প্রবন্ধের লক্ষণ, অর্থাৎ, যে রচনায় অর্থসম্বন্ধ কোনোভাবে পরিত্যক্ত হয়নি বা ব্যাহত হয়নি, তাকেই বলা যাবে 'প্রবন্ধ'।

বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দের পাশাপাশি 'নিবন্ধ', 'সন্দর্ভ', 'প্রস্তাব', 'রচনা' প্রভৃতি শব্দ সমার্থবোধক প্রচলন লাভ করেছে। দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর আলোচনায় এইসব ভিন্ন শব্দের পৃথক পৃথক ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যান করে দেখিয়েছেন যে, গ্রন্থের বৃত্তি বা টীকা অর্থে 'নিবন্ধের' ব্যবহার সংস্কৃতে সুপ্রশস্ত; আর, 'সন্দর্ভ' কথাটির মানে হলো, সম্যকরূপে গ্রন্থন, রচন বা সংগ্রহণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে জীবগোস্বামীর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ষট্‌সন্দর্ভ'। রচনা বিশেষের গূঢ়ার্থের প্রকাশক হিসেবেও সন্দর্ভ' কথাটির প্রয়োগ দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে।

উনিশ শতকের প্রথমে, যখন, নবজাত সাহিত্যিক-বাংলা গদ্যে বাঙালী মনীষীরা ব্যাখ্যানমূলক বা বর্ণনমূলক রচনায় উদ্যত হলেন, তখন, 'প্রস্তাব' শব্দটিরও বহুল ব্যবহার সুরু হলো। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি লেখকদের নানা গদ্যরচনা 'প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়েছে।

এইসব ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উল্লেখ করে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বাংলায় ইংরেজি 'Essay'-র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত প্রধান দুটি শব্দ 'প্রবন্ধ' এবং 'রচনা'-র মধ্যে একটি পার্থক্য কল্পনা করেছেন। ইংরেজিতে Essay-র দুই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে—এক হলো, Familiar অথবা Personal Essay, আর এক হলো, Expository Essay। দাশগুপ্ত মহাশয় প্রথম শাখার নামকরণে বাংলা 'রচনা' শব্দের উপযোগিতা এবং শেষোক্তের সংজ্ঞাবিধানে 'প্রবন্ধে'র ঔচিত্য স্বীকার করেছেন। কালক্রমে বাংলায় এই দুই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রকৃতি যদি এই দুটি পৃথক নামে বোধগম্য হয়, তাহলে, দাশগুপ্ত মহাশয়ের

* বাঙলা সাহিত্যের একদিক; পৃঃ ১৮

কাছে আমাদের স্থায়ী কৃতজ্ঞতা থাকবে। কিন্তু এই পার্থক্যবোধক পৃথক শব্দযুগলের আনুগত্য স্বীকার করবার পূর্বে এই শব্দ দুটির সম্পর্কে তাঁর নিজের টীকা-টিপ্পনী একবার বিচার করে দেখা উচিত। তিনি বলেছেন,

বাংলায় ইংরেজী Essay শব্দের প্রতিশব্দরূপে যে কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে তাহার ভিতরে রচনা শব্দের প্রয়োগকেই আমরা সুষ্ঠুতম বলিয়া বিবেচনা করি।...রচনা শব্দটির ভিতরে একটা সৃষ্টির কথা অনুস্যূত হইয়া আছে ; রচনা বলিয়া সাহিত্যের শ্রেণীটির ভিতরেও যে একটা অসাধারণ চমৎকারকারিণী নির্মিতি রহিয়াছে, ঐ শব্দটির ভিতরেই তাহার বেশ একটা ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইখানেই আমরা প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং রচনা-সাহিত্যের ভিতরে একটা ভেদরেখা টানিতে চাই। প্রবন্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টি নহে, রচনা সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইংরেজী Essay এবং Treatise, Discourse, Dissertation শব্দের ভিতরে যে তফাৎ, রচনা এবং প্রবন্ধের ভিতরে আমরা সেই তফাৎ কল্পনা করিতে পারি।

দাশগুপ্ত মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন :—

যে পার্থক্যের কথা এখানে বলিতেছি তাহা ঐতিহাসিক নহে,—তাহা অনেকখানিই অর্থগত। তবে এই অর্থগত ভেদকে অবলম্বন করিয়া আমরা প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরকার এই প্রভেদকে যদি এখন হইতে মানিয়া লই, তাহা হইলে একটি সাহিত্যিক শ্রেণী হিসাবে রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং পরিধি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

তাঁর এই প্রস্তাবের আন্তরিকতা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি ঔদাসীন্য যখন নিষ্ঠাবান ছাত্রের পক্ষে পরিত্যাজ্য, তখন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী,' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানা প্রবন্ধ', রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রবন্ধমালা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'—প্রবন্ধ নামধেয় এতোগুলি,—এবং এ ছাড়া, সমনামলাঞ্ছিত অন্যান্য বহু গ্রন্থাবলীর

অস্তিত্ব মনে রেখে দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির অধোরেখ মন্তব্যটি মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য।

ইংরেজি Essay এবং Treatise, Discourse, Dissertation প্রভৃতি শব্দের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে, সন্দেহ নেই। শেষোক্ত শব্দত্রয়ের অর্থ সুস্পষ্ট। এই আলোচনার পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে যে, Essay-র দুই শ্রেণী আছে; এক হলো, ব্যক্তিগত মননপ্রধান শ্রেণী, অন্যটি হলো, ব্যাখ্যান-লক্ষ্য শাখা। Lamb-এর Old China, Hazlitt-এর Old Familar Faces, R. L. Stevenson-এর Travels with a Donkey—এগুলিও প্রবন্ধ (Essay),—আবার, Newman এর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত রচনা প্রবন্ধ নামে অভিহিত হয়। ইংরেজিতে Essay শাখাটিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে একাধিক উপশাখার একাধিক নাম দেওয়া হয়েছে। বাংলার দীর্ঘ-ব্যবহৃত 'প্রবন্ধ' শব্দটিকে কেন্দ্রচ্যুত করবার বৈপ্লবিক অপপ্রয়াস পরিহার করে ইংরেজি সাহিত্যসংজ্ঞানির্মিতির আদর্শ অনুসরণ করে সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত গদ্যসন্দর্ভের মূল শাখার নাম প্রবন্ধ, এবং, তার দুই উপশাখার জন্য যথাক্রমে 'বক্তিগত মননপ্রধান প্রবন্ধ'—এবং 'ব্যাখ্যানলক্ষ্য প্রবন্ধ' নাম দুটি ব্যবহার করলে প্রাজ্ঞজনের আপত্তি হবে কি? দাশগুপ্ত মহাশয় নিজেই বলেছেন,

> ল্যাম্বের রচনাকেও Essay বলা হয়, বেকনের রচনাকেও Essay বলা হয়, আবার লকের দার্শনিক তথ্য ও যুক্তি-তর্ক সমন্বিত সুদীর্ঘ গ্রন্থকেও Essay on Human Understanding বলা হয়।

এই জাতীয় প্রয়োগের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য:

> Essay শব্দটিও ইংরাজীতে অতি ব্যাপক ভাবে এবং অসাবধানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

বাংলা উপন্যাস হলো বাংলা সাহিত্যের বয়ঃকনিষ্ঠ কীর্তিমালার অন্যতম,—উপন্যাসও গদ্যে লেখা এবং বাংলা প্রবন্ধের তা প্রায় সমবয়সী। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী এবং বিষবৃক্ষ, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন এবং শ্রীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি এবং ঘরে-বাইরে—বাংলায় এক 'উপন্যাস' নামেই এগুলি অভিহিত

হয়। বছর পনেরো আগে পাশ্চাত্ত্য গদ্য Romance-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'রমন্যাস' কথাটি চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল। সে চেষ্টা প্রত্যুষেই অস্তমিত হয়। Novel এবং Romance-এর মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে; তা-ছাড়া Novel-এর ও আবার নানাভেদ আছে। কিন্তু সেজন্য 'Novel'— এই দীর্ঘব্যবহৃত, সুপরিচিত শব্দটিকে বাতিল করে ইংরেজি সাহিত্য সেবকরা তো নতুন নতুন শব্দমালার জন্য কণ্ঠ-কণ্ডুয়ন প্রকাশ করেননি, বরং, যুগোপযোগী প্রয়োজনের খাতিরে তাঁরা Historical novel, Domestic novel, Social novel, Psychological novel ইত্যাদি বিশেষণ-সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অভিধা প্রয়োগ করে Novel-এর বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতার পরিচয় রেখে এসেছেন। তেমনি 'প্রবন্ধের' সাহিত্যিক দায়িত্বটুকু অগ্রাহ্য না করে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের সংজ্ঞা-বিধানকল্পে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ যোগে পৃথক পৃথক শ্রেণীর নির্দেশনা চলতে পারে। কিছুকাল পূর্বে Ernest Rhys সম্পাদিত Modern English Essays নামে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ যে প্রবন্ধসংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গুরু-লঘু বিভিন্ন ধর্মী প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে,—সেই গ্রন্থে বাচ্যার্থপ্রধান এবং বাচ্যার্থ-অতিশায়ী বিভিন্ন রচনা ঐ এক Essay-নামেই আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐ বইটির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে স্বনামধন্যা লেখিকা Virginia Woolf 'প্রবন্ধ' সম্পর্কে যা বলেছেন, সেই উক্তিটি অনুধাবন করলে ডক্টর দাসগুপ্ত Treatise, Dissertation, Discourse-এর প্রতি কেন যে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, তা বোধ হয়, ঠিকভাবে অনুমান করা যাবে। Virginia Woolf বলেছেন,

There is no room for the impurities of literature in an essay. Somehow or other by dint of labour or bounty of nature, or both combined, the essay must be pure—pure like water or pure like wine, but pure from dullness, deadness and deposits of extraneous matter.*

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' এই অর্থে pure, অর্থাৎ, বিবিধ মিশ্রণ সত্ত্বেও সে হলো খাঁটি সাহিত্য। সে রচনাকে Treatise বা Dissertation বা

* The Common Reader

Discourse বলে বাতিল করবার কোনো হেতু নেই। 'বিবিধ প্রবন্ধ' রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধমালা। দাশগুপ্ত মহাশয় রসিকসাধ্য এই স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেননি,—কেবল রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধকে 'প্রবন্ধ' বলতেই তাঁর আপত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ হলো সাহিত্যপদবাচ্য রচনা। বরং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একাধিক প্রবন্ধ নীরস Dissertation-এর পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। সেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে দাশগুপ্ত মহাশয় 'রচনাকার' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর স্ব-প্রবর্তিত 'রচনা'-দক্ষতার বিশেষ অর্থটি ভূদেবের প্রতি আরোপ করে দাশগুপ্ত মহাশয় নিজেও যে স্বস্তি বোধ করেননি তার প্রমাণ আছে তাঁর নিজেরই মন্তব্যে। তিনি বলেছেন,

> ভূদেবের তৃতীয় ধরণের লেখাকেই আমরা সত্যকারের সাহিত্যিক রচনা বলিয়া গ্রহণ করিব ;...

অর্থাৎ, ভূদেবে গদ্য-সন্দর্ভ যে সর্বাংশে সাহিত্যিক গুণমণ্ডিত নয়, এ বিষয়ে ডক্টর দাশগুপ্ত নিজেও নিঃসংশয়। তথাপি, তাঁকে 'প্রবন্ধ রচয়িতা' (দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্বকীয় অভিধা অনুসারে) না বলে 'রচনাকার' বলবার যুক্তি কোথায় ? এখানে পুনরায় স্মরণীয় এই যে, 'রচনা' ও 'প্রবন্ধের' এই সাহিত্যগুণ-ঘটিত নামবৈষম্যের কল্পনা দাশগুপ্ত মহাশয়েরই স্বকৃত কীর্তি। কিন্তু স্ব-প্রচারিত নামের প্রয়োগে তিনি নিজেই অসতর্ক হয়ে পড়েছেন।

এ-রকম প্রমাদ এ বস্থায় মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, যে অনৈতিহাসিক ভিত্তির ওপর দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর আলোচনা সুরু করেছেন, সেই ভিত্তিই দুর্বল। বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' কথাটি উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের অদ্যাবধি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, দাশগুপ্ত মহাশয় সে অর্থটি অনর্থক উপেক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজ পত্রের' মুখপত্রে লিখেছিলেন,

'আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে, অনেক লেখা আমরা অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধ সকল, অনাহূত কিম্বা রবাহূত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান করতে বলতে পারব ; কারণ আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না। এর লাভ যে কি,

তিনিই বুঝতে পারবেন, যিনি জানেন যে, যে কথা একশ'বার বলা হয়েছে তারি পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। যে লেখায় লেখকের মনের স্থান নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।'

এই উক্তিতে সাহিত্যিক গুণশূন্য প্রবন্ধের প্রতি অনাদর ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু সেজন্য 'প্রবন্ধ' নামে নীরস গদ্যবাহিত আলোচনার একটি পৃথক শ্রেণী সূচনায় কোনও প্রয়াস ঘটেনি। পক্ষান্তরে, স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধই যে যথার্থ 'প্রবন্ধ' নামবাচ্য, এই হলো দাশগুপ্ত মহাশয়ের অভিমত। যে গদ্য সন্দর্ভে 'লেখকের মনের ছাপ আছে', তাকে তিনি রচনা বলতে চেয়েছেন!

দাশগুপ্ত মহাশয়ের আলোচনা দেখে পাঠকের অস্বস্তি উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠাই স্বাভাবিক; কারণ, তিনি যে শুধু 'রচনা' এবং 'প্রবন্ধ' এই দুটি শব্দের দুটি পৃথক অর্থ ঘোষণা করে ক্ষান্ত হয়েছেন, তাই নয়; 'রচনা' শব্দের ব্যবহারে তাঁর ঈপ্সিত অর্থের সম্যক অনুসৃতি এই গ্রন্থভুক্ত তাঁর অন্যান্য মন্তব্যে তিনি নিজেই স্বীকার করেন নি। যেমন তিনি বলেছেন,

আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি এবং পরে আরও বিশদভাবে দেখিতে পাইব যে একজন রচনাকারও মূলতঃ একজন কবি এবং সত্যকারের একটি সাহিত্যিক রচনা ব্যাপক অর্থে একটি গদ্য-কবিতা।

এই ঘোষণার পরে যখন দেখা যায় যে তিনি নিজে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 'রচনাকার' নামে অভিহিত করেছেন, তখন পাঠকের মনে ন্যায়সঙ্গত যে প্রশ্নটি জেগে ওঠে, সেটি হলো এই যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আচার প্রবন্ধ'-ও কি গদ্যকাব্য? ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত অবশ্যই তা মনে করেন না। কিন্তু তাঁর 'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক' পড়লে পাঠকের পক্ষে তাঁর বক্তব্যের দিঙ্‌নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন করা এইভাবে উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এবার, ডক্টর দাশগুপ্ত মহাশয়ের আর একটি মন্তব্য সম্বন্ধে অনাস্থা নিবেদন করে এই আলোচনার উপসংহারে পৌঁছোনো যাক। সেই মন্তব্যটি বর্তমান আলোচনায় এর আগেই আংশিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,—এখানে পুরো উক্তিটিই তুলে দেওয়া হলো—

ইংরেজিতে যাহাকে Essay literature বলা হয়, সেই অর্থেই আমি 'রচনা-সাহিত্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছি।

তাই যদি তিনি করতেন তাহলে 'রচনা' এবং 'প্রবন্ধ' এই দুটি শব্দ নিয়ে এতো বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন হতো না। কারণ, ইংরেজিতে Personal Essay-ও Essay, আবার Expository Essay-ও Essay। একথা বর্তমান আলোচনায় একাধিকবার বলা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য-সংজ্ঞা ব্যাখ্যানমূলক একখানি ছাত্রপাঠ্য বই থেকে এ বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেখা যেতে পারে:—

An essay by Bacon consists of a few pages of concentrated wisdom, with little elaboration of the ideas expressed ; an essay by Montaigne is a medley of reflections, quotations and anecdotes ; in an essay by Addison, the thought is thin and diluted, and the tendency is now towards light didacticism and now towards personal gossip ; Lock's Essay concerning Human Understanding is a ponderous volume close-packed with philosophic matter ; the essays of Macaulay and Herbert Spencer are really small books. ‡

দাশগুপ্ত মহাশয় ইংরেজি ভাষায় Essay শব্দটির অর্থব্যাপকত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, ওপরের এই উদ্ধৃতি সে মন্তব্যের সমর্থক। সুতরাং বাংলা প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বোঝাবার জন্য তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের উদ্যম যে শ্লাঘনীয় সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপত্তির কারণ এই যে, 'প্রবন্ধ' শব্দটির সম্পর্কে তিনি একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং 'রচনা' কথাটির ওপর একটু বেশি মাত্রায় বলপ্রয়োগ করেছেন। সে বল অনুচিত। কারণ, সাহিত্যের দীর্ঘ-অভ্যস্ত সংস্কারের তা বিরোধী। দাশগুপ্ত মহাশয় যখন বলেন, 'সত্যকারের একটি সাহিত্যিক রচনা ব্যাপক অর্থে একটি গদ্য কবিতা'—তখন তাঁর ঈপ্সিত অর্থটি হলো—a truly literary essay is broadly speaking

‡ An Introduction to the study of Literature—W. H. Hudson p. 442.

a lyric in prose। কিন্তু বঙ্গানুবাদে ঐ উক্তির যে ভাষান্তরিত চেহারাটি দেখা যাচ্ছে তাতে বাঙ্গালী পাঠকের অর্থবোধে ভ্রম ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ইংরেজি composition-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় রচনা কথাটির বহুল ব্যবহার আছে। 'সাহিত্যিক রচনা' বললে বাঙ্গালী বুঝে থাকেন literary composition ;—literary essay-র বোধটি জাগিয়ে তুলতে হলে রচনা কথাটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিতে হয়,—লিখতে হয় 'রচনা'। বাংলা ভাষায় যখন উপযুক্ত শব্দের অভাব নেই, তখন, অনর্থক উর্ধ্ব কমার আড়ম্বর বাড়িয়ে কী লাভ হবে ?

দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'বাঙালা সাহিত্যের একদিক' তাঁর পাণ্ডিত্যের বহু অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ। তাঁর নামকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর ভক্ত পাঠক হিসেবেই এখানে আমার পাঠককৃত্য সারা হলো।

'রচনা' বললে কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনা—সব কিছুই বোঝা গিয়ে থাকে,—অতএব 'প্রবন্ধ' কথাটা চলুক Essay-র প্রতিশব্দ হিসেবে,—Essay-র শাখাভেদ আছে,—'প্রবন্ধ' ও হোক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত,—আর, 'আলোচনা' চলুক Treatise, Dissertation, Discourse-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। আশা করা যায়, সহানুভূতিশীল, পাঠকেরা এতে আপত্তি করবেন না ?

লোকরহস্য ও কমলাকান্ত

ডি-কুইন্সি দু'জাতের লেখার কথা বলে গেছেন—literature of knowledge এবং literature of power—জ্ঞানপ্রচারধর্মী রচনা এবং শক্তিমন্ত সাহিত্য।

All that is literature seeks to communicate power all that is not literature, to communicate knowledge.

রবীন্দ্রনাথ 'রসসাহিত্যে'র ব্যাখ্যান সূত্রে বলেছিলেন,—

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলি আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

এই কথার পরে আরো বিশদভাবে তিনি 'রসসাহিত্যের' স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সে মন্তব্যও উদ্ধৃতি হিসেবে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যে প্রকাশ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্য-গত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি।

এইখানে 'আনন্দ' কথাটির মানে বুঝে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই এ কথার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এবং কাব্যে 'আনন্দ' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে বারে বারে। সাহিত্য সম্পৃক্ত আলোচনাতে একালেও 'আনন্দ' কথাটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার ঘটে থাকে। 'আনন্দ' আর 'সুখ'—দুটি শব্দ সমার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশাটা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না।

সাহিত্যতত্ত্বের নানা বইয়ে এ সম্পর্কে নানা লেখকের নানা মন্তব্য জমেছে। এখানে সে বিষয়ে কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তবে, যে মন্তব্যটি স্মরণ করে বর্তমান রচনার সূত্রপাত করা হয়েছে, সেই উক্তির সঙ্গে সাহিত্যের এই আনন্দতত্ত্বের যোগ যে কোথায়, সেইটুকু জেনে রাখা দরকার,—এবং, সেই সম্পর্কটি জেনে নেওয়ার পরে ধারণোপযোগী একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোই এখানকার আশুলক্ষ্য। সেই সিদ্ধান্তটি কি?

সিদ্ধান্তটি হলো এই:—জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য,—দু'জাতের রচনাই পাঠকের আত্মবোধের সহায়ক। কিন্তু যে রচনা কেবল জ্ঞানের সামগ্রী

পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়, সে রচনা আমাদের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি সাধনেই পূর্ণ চরিতার্থতা পায়। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় পদার্থ পরস্পর ভেদ-ব্যবহিত। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জেনে আমাদের খণ্ডচেতনার অখণ্ডত্বে নিমজ্জন ঘটে না। অপর পক্ষে, ভাবের সাহিত্য, তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হলেও তার ফলশ্রুতি হয়ে ওঠে সর্বতথ্যসীমাতিশায়ী নিত্যরসের উদ্বোধক। তার লক্ষ্য হলো অখণ্ড আত্মব্যাপ্তিসাধনের অভিমুখে। জ্ঞানের সাহিত্য সীমাভিমুখী, ভাবের সাহিত্য অসীমাভিমুখী।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য?—তাকে অবিমিশ্র জ্ঞানের সাহিত্য বললে সত্যের অপলাপ হয়, কারণ, উনিশ শতকের আত্মভ্রষ্ট বাঙালীর শিক্ষাবিধায়ক ঐ দপ্তরগুলির মধ্যে নানা নীতিজ্ঞান যদিচ প্রচারিত হয়েছে, তথাপি, ঐ বইখানি শুধু নীতিজ্ঞান-গ্রন্থ নয়,—তার অতিরিক্ত এক চিরস্থায়ী আবেদনও ওখানে আছে। সে আবেদন হলো ভাবের আবেদন। জ্ঞান ও ভাব—এ বইয়ে এই দুটি উপাদানের যুগপৎ অস্তিত্ব বিরাজমান। কতোটা ভাব এবং কতোটাই বা জ্ঞান এখানে রাসায়নিক কোন্ প্রক্রিয়ায় পরস্পর সম্মিলিত হয়েছে, সে পরিমিতি বিচারের নিক্তি ধরা দুর্বল হাতের সাধ্য নয়—রসোপলব্ধির প্রবণতা থেকে মনকে বহুদূরে হটিয়ে আনতে না পারলে সে রকম শব্দব্যবচ্ছেদ-প্রয়াসে উদ্যত না হওয়াই সুযুক্তি—সেই শ্রমসাধ্য পাণ্ডিত্যসাধ্য, বিশ্লেষণসাধ্য দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য তোলা থাক। এখানে বাংলা প্রবন্ধের প্রায় শতাব্দীব্যাপী উৎকর্ষের ধারায় 'কমলাকান্তে'র বিশেষ মর্যাদার কারণগুলি একটু খুঁজে দেখা যাক। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয় রচনাবলীর কালানুক্রমিক প্রবাহে 'কমলাকান্তে'র উদ্ভবকাল সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস লেখা শেষ করলেন। তারপর, যথাক্রমে ১৮৬৬-তে এবং ১৮৬৯এ 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হলো। ১৮৬৯ থেকে '৭৪ পর্যন্ত তিনি বহরমপুরে ছিলেন। সেখান থেকে ১৮৭২-এর এপ্রিল মাসে (১২৭৯, বৈশাখ) কলকাতায় ছাপা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে ১৮৭৬-এর মার্চমাস পর্যন্ত পর পর চার বছর তিনি এই পত্রিকার তত্ত্বাবধান করলেন। ১৮৭৩-এ 'বিষবৃক্ষ' ও

'ইন্দিরা', ১৮৭৪-এ 'যুগলাঙ্গুরীয়' '৭৫-এ 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাধারাণী', '৭৭-এ 'রজনী', '৭৮-এ 'কৃষ্ণকান্তের উইল', '৮২-তে 'আনন্দমঠ', রাজসিংহ', '৮৪-তে 'দেবীচৌধুরাণী', '৮৭-তে 'সীতারাম' এবং ১৮৯৩-এ পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা' এবং 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। গল্প-উপন্যাস শ্রেণীর এই তেরখানি বই ছাড়া, ১৮৭৪-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য', '৭৫-এ 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', ৭৬-এ 'বিবিধ সমালোচনা', ৭৯-তে 'প্রবন্ধ-পুস্তক' ও 'সাম্য', '৮৪-তে 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত', '৮৬-তে 'কৃষ্ণ চরিত্র', '৮৭-তে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ভাগ), '৮৮-তে 'ধর্মতত্ত্ব (প্রথম ভাগ) অনুশীলন', ১৮৯২-তে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪-এর ৮ই এপ্রিল তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তার প্রায় আট বছর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অসমাপ্ত টীকা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'—এই সমস্ত রচনাই প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় 'বঙ্গদর্শনে'। অতএব, রচনাকালগত মনন-প্রকৃতির একটি অবশ্যম্ভাবী ঐক্য এই সব কটি রচনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পরে পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১০৭২ থেকে '৭৬ অবধি 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদনাপর্বের বহু পঠনশীল, সামাজিক, শ্রমনিষ্ঠ, বিচক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কমলাকান্তের বিচিত্র কথায়। 'কমলাকান্ত' এই পর্বের বঙ্কিমচন্দ্রেরই সামাজিক-আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার আধার। এই পাত্রে তাঁর পূর্ণ যৌবনের তপ্ত প্রাণোচ্ছ্বাস সামাজিক চিন্তাসূত্রে, স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের চতুর্বর্গীয় আলোচনায় অপূর্ব রাজসিকতায় ফেনিল হয়ে উঠেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পর্বের রচনা-প্রচেষ্টার ইতিহাসের শিরোনামায় লিখেছেন 'যুদ্ধপর্ব',—তার আগে গেছে 'উদ্যোগপর্ব'। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' (শ্রাবণ, ১২৯১) পত্রিকার আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে তাঁর শেষ জীবনের রচনাবলী 'শান্তিপর্বে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লোকরহস্য, কমলাকান্ত, সাম্য প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গদর্শন পর্বের প্রবন্ধগুলি সত্যই যুদ্ধাবহের স্মারক। এবং এ যুদ্ধ পৌরাণিক প্রথানুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো রণাঙ্গনের গদাযুদ্ধ নয়, আধুনিক সার্বিক রণকৌশলের বহুমুখিতার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের

মসীযুদ্ধনৈপুণ্য তুলনীয়। তিনি তাঁর রণাঙ্গনের বিস্তার ঘটাতে কুণ্ঠিত হননি, এবং বহুবিস্তীর্ণ সমরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে নিমেষের জন্যও রণে ভঙ্গ দেননি।

Wendel Wilkie-র One World-এ বর্ণিত জেনারেল মণ্টোগোমারি-র একটি উক্তি কমলাকান্তের বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে বসলে মনে পড়ে। Wendel Wilkie একবার মণ্টোগোমারি-কে জিগেস করেছিলেন, জার্মান সেনাপতি রমেলের কৃতিত্ব কি রকম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, He has one fault,—he repeats his tactics। উনিশ শতকের বঙ্গীয় সংস্কৃতির নবজাগরণপর্বের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তে' তাঁর রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। সেই বিচিত্র কৌশলের অভিনব সাফল্যের বিষয়ে দু'কথা বলতে হলে 'লোকরহস্য' থেকে আলোচনা আরম্ভ করা দরকার।

'লোকরহস্যে'র প্রথম সংস্করণ ১৮৭৪-এ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৮-তে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আটটি প্রবন্ধ ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন আটটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয় এবং রামায়ণের সমালোচনামূলক রচনাটি মূল সংস্করণে যেভাবে ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সে ভাবে না রেখে নতুন ভাবে লেখা হয়। 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রচার' থেকে দ্বিতীয় সংস্করণের 'লোকরহস্য' পুনর্মুদ্রিত হয়। ১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়ে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর, ১২৯২ সালে 'কমলাকান্ত' নামে পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' লেখা আছে :

এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরের, পুনঃ সংস্করণ নহে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ভিন্ন ইহাতে 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।…'চন্দ্রালোকে' আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।…কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া

বয়সের কথা” যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নাম যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও “কমলাকান্তের পত্র” মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

‘কমলাকান্তের’ তৃতীয় সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৯১-এ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ১২৮৯ সালের ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত ‘ঢেঁকি’ প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়।

‘লোকরহস্যে’ বঙ্কিমচন্দ্র হাস্য-পরিহাসের অস্ত্রচলনার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়ে ‘কমলাকান্তে’ সে অস্ত্র পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ করেছেন। ‘লোকরহস্যে’র ‘ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল’ প্রবন্ধটিতে (পর পর দু’টি খণ্ডে সম্পূর্ণ) বর্ণিত সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসভা ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যগর্বী ইংরেজ-শাসককুলের প্রতীকমাত্র। বৃহল্লাঙ্গুল এই সভার প্রধান বক্তা, অমিতোদর এই সভার সভাপতি, মহাদংষ্ট্রা অন্যতম শ্রোতা, দীর্ঘনখ এক সুশিক্ষিত তরুণ জিজ্ঞাসু! বৃহল্লাঙ্গুল বৃহৎ সত্য ঘোষণা করেছেন—

সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি, বলবানের আহারান্বেষণের নাম দস্যুতা, লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না, তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই নামবৈচিত্র্য স্মরণ করিবেন, নচেৎ লোক অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই, এক উদরপূজা নাম রাখিলে বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

বৃহল্লাঙ্গুলের আর একটি উক্তি :—

মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদাই আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। …শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে।

বৃহল্লাঙ্গুল বন্দী অবস্থায় একদা মানুষের ব্যাঘ্রদর্শন-স্পৃহা চরিতার্থ

করে এসেছিলেন। মানবসমাজ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তিনি সেই সুযোগ অর্জন করেন, তারই ভিত্তিতে তিনি বলেছেন—

আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীব হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।

এই উক্তির পরে বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় লিখেছেন—

পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এরূপ তর্কে জেম্স্ মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য-পণ্ডিতে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

মানবসমাজের বৈশ্য-দাসত্বের সম্পর্কে বৃহল্লাঙ্গুল তাঁর ভাষণের অন্যত্র বলেছেন—

মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ,···পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্য সমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাঁহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা

থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।

মানবসমাজের (বিশেষতঃ উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু-সমাজের) বিবাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃহল্লাঙ্গুল প্রচলিত বিবাহ-রীতির তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন— নিত্য, নৈমিত্তিক ও মৌদ্রিক; এবং; পুরোহিত-শ্রেণীর পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যাঘ্রাচার্য আরও বলেছেন,

বঞ্চকে যদি চাল-কলা খায়, তাহা হইলে পুরোহিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্যের উচ্ছিষ্টভোজী স্বভাবনিন্দক তামসিক দেশীয় বৈযাকরণদের বঙ্কিমচন্দ্র বানর গোষ্ঠীভুক্ত জীব রূপে চিত্রিত করে সেই গোষ্ঠীর এক প্রতিভূর মুখে নিম্নোক্ত স্বীকৃতি আরোপ করেছেন:

আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানরজাতি চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।

'লোকরহস্যের' 'বাবু'-প্রবন্ধে বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী, চসমালঙ্কৃত,··· বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয়, চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল উনিশ শতকীয় বাঙ্গালী বাবুর দশ অবতারের একটি তালিকা আছে। সে তালিকাটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন:—কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। এই 'বাবু' সম্প্রদায়ের বিচিত্র শক্তি-সামর্থ্যের উল্লেখকালে লেখক বলেছেন,

যাঁহার বল হস্তে একগুণ মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু।···যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু।

'গর্দ্দভ'-প্রবন্ধে নির্বোধ বিচারক, শিক্ষক, গায়ক, সম্রাট ইত্যাদি সকল

জড়ধর্মী অহঙ্কারীর দেহে তিনি বৃহৎ গর্দভমুণ্ডের হাস্যকর, ভয়াবহ সঞ্চালন লক্ষ্য করে বলেছেন,

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই এজন্য তুমি শান্ত; বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর; বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান এবং মোট না বহিলে খাইতে পাওনা, এজন্য তুমি পরোপকারী।

'বাবু' ব্যতীত 'হনূমদ্বাবু সংবাদ' নামে বাবু বিষয়ক অন্য একটি প্রবন্ধ 'লোকরহস্যে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আত্মভ্রষ্ট বাঙালী বাবুর ইংরেজি ভাষার প্রতি ভক্তির বাহুল্য এবং মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা লক্ষ্য করে 'বাবু'-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তিরস্কার বর্ষণ করেছিলেন, 'হনূমদ্বাবু সংবাদে'ও ব্যঙ্গদিগ্ধ অনুরূপ তিরস্কার সঞ্চিত আছে। হনূমদ্বাবু-কথিত প্রায় শতবর্ষ পূর্বের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত আধুনিক বাংলার বাবুদের আত্মশোধনের পক্ষে অদ্যাবধি সহায়ক:

হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা বল।

প্রবন্ধের উপসংহারে Local Self-Government-মদগর্বিত 'বাবু' হনুমানের বোধ শক্তির দৈন্য স্মরণ করে যে খেদোক্তি করেছেন, সে খেদোক্তি তাঁর আত্মদৈন্য-স্বীকৃতির মতো চিত্তাকর্ষক—বঙ্কিমচন্দ্র সেই উক্তির মধ্যে সুকৌশলে কিছু নাট্যরস সিঞ্চন করেছেন। Dramatic Irony-র মতোই তা' বিস্ময়কর! বাবুর সেই চূড়ান্ত অভিযোগটির পাত্র হলেন বাবু নিজেই,—অন্য কেউ নয়! বাবু বলেছেন,

ছি ছি বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।

'বাবু' হনুমানকে এই কথা শুনিয়ে যখন আত্মপ্রসাদ লাভে উদ্যত হন, তখন স্মিতহাস্যে পাঠকের সঙ্গে লেখকের একবার দৃষ্টিবিনিময় হয়ে যায়। সে দৃষ্টির টীকা নিষ্প্রয়োজন।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য মদলালিত অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলো মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা। তার আগে যিনি ছিলেন 'মাটির কাছাকাছি', সেই নিধুবাবু যদিও বলেছিলেন,

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

তথাপি, তৎকালীন ভদ্র সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বাবু-গোষ্ঠী বলতেন—

Polished society-তে কি ও সব চলে ?

'ইংরাজস্তোত্র' নামক রচনায় ইংরেজ প্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণের ঘোষণাটি সুখপাঠ্য, এবং এই প্রসঙ্গে সেটি একই সূত্রে স্মরণীয়।

লোকরহস্যের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' প্রবন্ধে এই গোষ্ঠীর এক ব্যক্তির স্ত্রীর মুখে এঁদের রুচিবিকার সম্পর্কে কান্তাসম্মিত, পরিহাস-প্রহসিত, ঘৃণাচিহ্নিত যে উক্তিটিকে বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন, সেটি নিচে তুলে দেওয়া হলো। 'Polished society'-র ধ্বনিসাদৃশ্য বজায় রেখে বাঙালী বাবুর বহু গুণবতী স্ত্রী বলেছেন,

ছিঃ এই বুঝি তোমার পালিশ ষষ্ঠী ? তোমার পালিশ ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী অনেক ভাল।

এই 'বাবু'-সম্প্রদায়ের বর্ষারম্ভ হতো—পয়লা বৈশাখে নয়,—পয়লা জানুয়ারি-তে ; শুভদিনে কলসী উৎসর্গের অভিরুচি এঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ; তার বদলে সবান্ধবে মদ্যমাংস পানাহারে নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপন করে, সাহেবদের কাছে ভেট পাঠিয়ে এঁরা কৃতার্থ বোধ করতেন। একদা রাম বাবুর স্ত্রী এ-বিষয়ে কান্তাসম্মিত যৎকিঞ্চিৎ বিরোধিতা প্রকাশ করায় রাম বাবু অবিলম্বে উকিলের বাড়ী গিয়ে 'হিন্দুর divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' করলেন। এই তথ্যটি পাওয়া যাচ্ছে 'লোকরহস্যের' অন্তর্ভুক্ত New years' Day প্রবন্ধে।

সে-সময়ে দেশী হাকিমদের বিচারাধিকারে য়ুরোপীয় আসামীদের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে Ilbert Bill উপলক্ষে করে দেশে যে আন্দোলন চলেছিল, তার একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র আছে 'লোকরহস্যে'র Bransonism-প্রবন্ধে। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কলমে প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণা যে কতদূর হাস্যকর অপলাপ-মালায় পর্যবসিত হতো, তার নমুনা আছে 'কোন স্পেশিয়ালের পত্রে'। এই গবেষকের আবিষ্কৃত তথ্যগুলির প্রত্যেকটিই সমান চমকপ্রদ, যেমন, তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের ইংরেজি নাম Bengal থেকে অনুমান করা যায় যে, Benjamin gall নামে কোন এক ইংরেজ এই দেশ আবিষ্কার করেছিলেন ; বাঙালীদের মধ্যে যাদের চুল কুঞ্চিত তাঁরা কাফ্রী, আর, যাঁরা

কিছু গৌরবর্ণ তাঁরা হলেন পূর্বোক্ত Benjamin সাহেবের বংশসম্ভূত; ম্যাঞ্চেষ্টারের সংশ্রবে আসবার আগে বাংলাদেশের জনসাধারণ ছিলেন দিগম্বর; বাংলা ভাষা ইংরেজি ভাষার একটি উপশাখা মাত্র; হিন্দুরা বহু জাতিতে বিভক্ত, যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, কুলীন, বংশজ, বৈষ্ণব, শাক্ত, রায়, ঘোষাল, টেগোর, মোল্লা ফরাসী, রামায়ণ, আসাম, মহাভারত, গোয়ালপাড়া, পারিয়া ডগ্‌স্। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'-এর বহু আগে উনিশ শতকের অষ্টম দশকে এ-রকম খাপছাড়া খুশির রস পরিবেশনের সিদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে এইভাবেই সার্থক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 'স্পেশিয়েলের' এই পত্রের শেষতম অনুচ্ছেদটির কটাক্ষ বহুকটাক্ষপটু বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যেও বিরল দৃষ্টান্ত। য়ুরোপীয় গবেষক-টি লিখেছিলেন—

হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,—

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি তুমি গলায় পর।

এই অনুচ্ছেদটি পড়ে শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মৃদু হাস্য সহসা অট্টহাস্যে পরিণত হয়,—তারপর, সেই হাসির আলোড়ন যখন শান্ত হয়ে আসে, তখন, নবশক্তিসমৃদ্ধ পাঠকচিত্ত নিজের স্মৃতির মধ্যে এই ব্যাপারের সাদৃশ্য খুঁজতে চেষ্টা করে। এই গবেষণা কি Pickwick-সমিতির স্মারক? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের সুঅধীতী বাঙালী লেখকদের মধ্যে অন্যতম। Sir Walter Scott, Wilkie Collins, Reynolds, Boccaccio, Kriloff, Lytton, Haggard, Marryat, Hugo, Rosbart ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য লেখকবৃন্দের গল্প-উপন্যাসের প্রতি সাহিত্যানুরাগী বাঙালী লেখক-পাঠকের সে-যুগে শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। প্রথিতযশা Dickens অবশ্যই এই নামাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তথাপি, পূর্বোদ্ধৃত গবেষণার সাদৃশ্যক্ষেত্র Dickens-এর Pickwick-সমিতির বিচিত্র অনুসন্ধিৎসার মধ্যে নয়,—এমন পাণ্ডিত্যের তুলনা মেলে বরং সংস্কৃত নাটকের

ক্ষেত্রে,—বিদূষকের অপভাষণে, প্রিয়বয়স্যের অনুশীলিত মূর্খতায়। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের দুর্বৃত্ত শকারের পাণ্ডিত্য-বিলসন হলো এই 'স্পেশিয়েল'-এর গবেষণার যোগ্য উপমান। বসন্তসেনাকে প্রহার করবার সময়ে শকার বলেছিল—

চাণক্কেণ জধা শীদা মালিদা ভালদে জুএ।
এব্বং দে মোড়ইশ্‌শামি জড়াউ বিঅ দোবদিং॥

[চাণক্য যেমন ভারতযুগে সীতাকে মারিয়াছিলেন, কিংবা জটায়ু যেমন দ্রৌপদীকে নিষ্পেষণ করিয়াছিল, সেইরূপ আমি তোকে নিষ্পেষণ করিব।]*

মৃচ্ছকটিক নাটকের অনেক জায়গায় শকারের অনুরূপ অনেক উক্তি আছে। শকার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের চিরপ্রসিদ্ধ নানা বিদূষকের মধ্যে অন্যতম; সে বিদূষক নয়—স্বভাবলম্পট মূর্খ রাজশ্যালক মাত্র। লম্পট, মদ্যপ ও মূর্খের মুখে এই জাতীয় কথার আরোপ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বেও একেবারে লোপ পায়নি। অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে নিশীথ-নগরীর পথচারী মদ্যপটি বলেছে, 'জানকীর দশা দেখে হাসে দুর্যোধন'।

লোকরহস্যের 'রামায়ণের সমালোচনা' এবং কোনও 'স্পেশিয়েলের পত্র' একই পর্যায়ভুক্ত রচনা। দুটি প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিলো একই বিষয়,—অর্থাৎ, ভারতীয় কোন বিষয়ের গবেষণার ব্যাপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হাস্যকর দাম্ভিকতা উদ্ঘাটন করা।

'বর্ষ-সমালোচনা' কিন্তু অন্য ধরণের সমালোচনা। খবর-কাগজে প্রতি নববর্ষসূচনায় পূর্ব বর্ষের সালতামামি প্রকাশের যে সংস্কার অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই রীতি অনুসরণ করে 'বঙ্গদর্শনে' ১৮৭৫ সালের সালতামামি রচনার প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধটিতে অপেক্ষাকৃত তরল হাস্যরস পরিবেশন করে গেছেন। এই লেখাটির উপসংহারে পাঠককে আহ্বান করে তিনি বলেছেন—

আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস-জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল।

এর আগে যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিতে পরিহাস যেমন তৎকালীন বিশেষ-বিশেষ সমস্যার অথবা অপব্যবহারের নিন্দনীয়ত্ব উপলক্ষ করে শাণিত হয়ে উঠেছে, 'বর্ষ-সমালোচনায়' তেমন নয়। 'পঁচাত্তরেও

---

* শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যের অনুবাদ।

ঘাস-জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল'—বাঙালীর এই সর্বজনীন নৈরাশ্যতথ্যটিই এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

'লোকরহস্যের' দ্বৈভাষিক রচনাপুঞ্জের মধ্যে হনূমদ্বাবু-সংবাদ, New year's Day, Bransonism এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর—এই চারটির উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম দ্বৈভাষিক রচনাটির নাম—The Matrimonial Penal Code (দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন)। এই নাম থেকেই বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আলোচনার যথাস্থানে একদিকে, ভারতীয় Penal Code, অন্যদিকে, ঊনিশ শতকের বাঙালীর দাম্পত্য সম্পর্ক একই পাত্রে মর্দিত হয়েছে। Penal Code-এর চিরস্মরণীয় হাস্যকর অসারত্ব ঘোষিত হয়েছে 'দেবীচৌধুরাণী'তে। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচ্য। আপাততঃ, বাঙ্গালীর দাম্পত্য বিষয়ে বঙ্কিম-ভাষিত Penal Code-এর কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত হলো :—

2. A husband is a piece of moving and movable property at the absolute disposal of a woman.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

২ ধারা। যে কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

৪ ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষদের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে।

স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসীর স্বাক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্র এই আইনের খড়সা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদিকার কলম দিয়ে তিনি লিখিয়েছিলেন :

সকলের স্বত্বরক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব-রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাশ হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করাইবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে হিন্দুর বিবাহ সম্পর্কে নানান বিতর্ক, নানান আলোচনা ঘটে গেছে। Bentinck-এর সতীদাহ দমন-আইনের আগেও এদেশে দাম্পত্য বিধিব্যবস্থার সংস্কারকামীর অভাব ছিলনা।

শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়, বিদ্যাসাগরের একাধিক পুস্তিকায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'গৃহকথা'মালায়—কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ-আলোচনা ঘটেছে। সেইসব কথার মুখ্য প্রেরণা ছিল মানবিকতাবোধ,—ইংরেজিতে যাকে বলে humanitarianism। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—প্রথম পুস্তক' প্রকাশিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সর্বসমেত দু'হাজার বই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যাপক সহানুভূতিচর্চার সেই শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পর্কের অর্থনৈতিক দিকটা এদেশে খুব বেশি আলোচিত হয় নি। কৌলীন্য-প্রথার আলোচনায়, প্রসঙ্গতঃ, এই দিকটির কথা ওঠা সহজ ছিল। সে কথা একেবারে যে না উঠেছে, তাও বলা চলে না,—তবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণে বিবাহের যে একটি অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আছে,—প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত এই ধ্রুব সত্যটির বিচারে-ব্যাখ্যানে সে কালের মনীষীরা সাহিত্যের পাত্র পূর্ণ করে তুলতে মন দেন নি। সে আলোচনা পরবর্তী যুগপরিবেশের প্রতীক্ষায় ছিলো। Ibsen, Bernard Shaw প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায় এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্পর্কচেতনার অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ছায়া পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোক রহস্যের' 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইনে' যে পরিহাস প্রচার করে গেছেন, তার মূলেও সেই উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত সন্তুষ্টি এবং ক্ষীণ মানবিকতাবোধই প্রেরণা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবিকতাবোধ যে সর্বত্র ক্ষীণ ছিল, সেরকম মন্তব্য এই উক্তির অভিপ্রেত নয়। বিশেষতঃ 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন' সম্পর্কেই 'ক্ষীণ' বিশেষণটি

গ্রাহ্য। তাঁর রচনার অন্যত্র সহানুভূতির অপেক্ষাকৃত তীব্র ও ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে।

মধ্যবিত্ত সন্তুষ্টি সম্পর্কে ওপরে যে মন্তব্যটি করা হলো, তার একটু ব্যাখ্যা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে, এদেশের জনচৈতন্য তীব্র এক আলোড়নের প্রতিক্রিয়ায় এক নবভাব লাভ করেছিল। সে তথ্য আজ বহু প্রচারিত, বহু-স্বীকৃত ঐতিহাসিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই মনোভাব সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র প্রদেশে সঞ্চারিত-বিস্তারিত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের অর্থনৈতিক দিকটি সে যুগে একালের মতো সর্বজনীন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তার কারণ, অর্থচিন্তা সে যুগে আজকের মতো সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। রমেশ চন্দ্র দত্তের একটি মন্তব্য থেকে অবস্থাটি কিছু পরিমাণে অনুমিত হতে পারে :—

The rule of the East India Company terminated in 1858. The first Viceroys under the Crown were animated by a sincere desire to promote agricultural prosperity, and to widen the sources of agricultural wealth in India. Statesmen like Sir Charles Wood and Sir Stafford Northcote, and rulers like Lord Canning and Lord Lawrence, laboured with this object. They desired to fix the State-demand from the soil, to make the nation prosperous, to create a strong and loyal middle class, and to connect them by their own interest with British rule in India.*

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ছিলো প্রধানত: এই 'strong and loyal middle class'-এর সৃষ্টি। ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে এঁদের loyalty যে সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ ছিলো, তা নয়; কিন্তু, আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি চর্চার জন্য সমাজদেহে অর্থবণ্টনধারার এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধন আবশ্যিক পূর্বানুষ্ঠান রূপেই-যে গ্রাহ্য, সে-রকম স্বীকৃতিমূলক কোনো উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের ভূমিকায় উনিশ শতকের আলোচ্য পর্বের লেখকরা অবতীর্ণ হন নি।

* The Economic History of India in the Victorian Age (Preface)

ফলে, পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সংঘাতে এদেশে যে নবজাগরণ ঘটলো, সে জাগরণ হলো অংশতঃ আচারপরিবর্তক, অংশতঃ দর্শনানুপ্রেরক, অংশতঃ সাহিত্যস্রজক,—কিন্তু, মানবসমাজের সমষ্টিগত পারমার্থিকতা-প্রবণতা আর্থিক স্বাস্থ্যকে পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে যে কুসুমিত হতে পারে না,—এই সহজ বাস্তব চেতনা সে-যুগের সাহিত্যিক চেতনায় সার্থক হয়ে ওঠেনি। এক রকম আত্মবঞ্চক সন্তুষ্টির মধ্যে এঁদের দিন কেটেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত—বাংলা উপন্যাস রচনায় এঁরা প্রত্যেকেই সমাজচিত্র পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর অর্থগত নির্ভরশীলতার কথা এঁদের কারও রচনায় প্রাধান্য লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুগোচিত নিস্পৃহতার ব্যতিক্রম নন। বিশুদ্ধ দারিদ্র্যের চিত্র এঁরা যে না এঁকেছেন, তা নয়; কিন্তু দারিদ্র্য যে পাপ,—দারিদ্র্য যে অন্যায়,—শ্রেণীবিশেষের অতি-ভোগাভ্যাসের স্বার্থপরতায় অপরাপর শ্রেণীর অনশন যে অবশ্যম্ভাবী,—এসব তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে-গল্পে আশ্রয় পায়নি,—পেয়েছে তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধে, যেমন 'সাম্য' এবং 'বিড়াল',—এই দুটি প্রবন্ধে। সমাজদেহের অর্থমূল অস্বাস্থ্যের চিন্তায় শরৎচন্দ্রও মূলতঃ পরাঙ্মুখ;—আর্থিক অনর্থের কথা তাঁর উপন্যাসে প্রবেশ করেছে প্রসঙ্গসূত্রে অথবা কারুণ্য-রঞ্জকতাগুণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এই প্রদেশ পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন;—'গল্পগুচ্ছে' মানবসংসারের অর্থবশ্য উৎকর্ষ-অপকর্ষ-সম্ভাবনা তিনি লঘুগুরু রেখাপাতে স্থলে স্থলে চিত্রিত করেছেন। মার্ক্সীয় পর্যালোচননীতির প্রভাব বিস্তারের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অবধি ঔপন্যাসিকেরা দারিদ্র্যের কারুণ্যে মাত্র উৎসাহী ছিলেন,—দারিদ্র্যের পর্যালোচন-দায়িত্ব যে-অর্থনৈতিক চেতনার ফলে সাহিত্য-সাধনার বরণীয় উপাদান হয়ে ওঠে, সেই বিশেষ অবস্থা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ শাসিত বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকট হয়নি। ১৯৩০-এর আগে এ নিয়ে বাংলাদেশের লেখকরা মাথা ঘামাবার তাগিদ বোধ করেননি। যাক, সে বিষয়ে যথাস্থানে দু'এক কথা বলা যাবে।* এখন দাম্পত্য সম্পর্ক অবলম্বনে লোকরহস্যের অন্তর্ভুক্ত আর একটি রচনার কথায় আসা যাক। 'বসন্ত ও বিরহ' বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গদক্ষতার আর এক দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী

* সাহিত্য পাঠকের ডায়েরি, ২য় খণ্ড—'বাংলা উপন্যাসের প্রথম শতবার্ষিকী' দ্রষ্টব্য।

রচনা 'দাম্পত্য-দণ্ডবিধির আইনের' সঙ্গে এই লেখাটির তুলনা করলে প্রধান দুটি তত্ত্ব মনে পড়ে,—এক হলো, এই দুটি রচনার বিষয়বস্তুর আংশিক সাদৃশ্য,—দুটি রচনাতেই স্ত্রী-পুরুষের পরিণয়-সম্পর্ক অবলম্বন করে পরিহাস সৃষ্টি করা হয়েছে,—এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রথমটিতে Penal code-এর আইনী ভাষার অনুকরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে হাসিয়েছেন, আর, দ্বিতীয়টিতে সংস্কৃত কাব্যের শৃঙ্গার-বর্ণনরীতির,—বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভ-কথার অনুকরণে তিনি রামীর মুখে অলঙ্কৃত বাক্যাবলী দিয়ে বামীর মুখে নিরলঙ্কৃত বাস্তবের বর্ণনা আরোপ করেছেন। এই দুই সখীর কাব্যালোচনার মধ্যে এসে পড়েছে শ্যামী,—সে ভাল লেখাপড়া জানে না, একটু একটু জানে মাত্র। ফলে রামী যখন বলে, 'মলয়মারুত মৃদু মৃদু প্রবাহিত',—বামী তার জবাবে বলে, 'তদ্বাহিত ধূলায় দন্ত কিচ্‌কিচিত।' এবং রামী যখন বলে, 'কেমন চূতলতা সকল নবমুকুলিত,'—শ্যামী তখন জিগেস করে, 'সই আঁবের গাছই দেখিয়াছি; আঁবের লতা কোন্‌গুলা?'

—অতীতের রিকৃথ-লব্ধ বসন্তের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার বসন্ত যে বিরোধ নির্দেশ করে, কবিপ্রসিদ্ধির রমণীয়তা বাস্তব জীবনের আবেষ্টনীর দ্বারা যেভাবে লাঞ্ছিত হয়,—সেই তিক্ততার উদ্ঘাটন লোকরহস্যের 'বসন্ত ও বিরহ' নামক রচনায় এইভাবে সরস হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'সুবর্ণ গোলক' নামক রচনাটিও স্মরণীয়; কারণ, সেই আখ্যায়িকার বাহনে বাস্তব জীবনের আর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাকে বঙ্কিমচন্দ্র সরস করে তুলেছেন। স্বর্গের দেবদেবীর ক্রীড়নক সুবর্ণ-গোলক মর্ত্যে যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো, তখন, পার্বতী কৈলাস-পতিকে বললেন, 'আপনি ইহা সংবরণ করুন'। মহাদেব বললেন,

হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? একাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে? কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক তাহা কেহ

দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম।

'লোকরহস্য' নামটি সার্থক। এর প্রতিপাদ্য বিষয়, শুধু বাঙ্গালীরহস্য অথবা ইংরেজ-রহস্য নয়। বৃহৎ মানবসমাজ কোনো সংকীর্ণ ভৌগোলিক পরিসীমায় আবদ্ধ নয়;—'লোকরহস্য' হলো সারা দুনিয়ার মানবপ্রকৃতির রহস্য। হাস্য-পরিহাসের সুরে এই রহস্যকথার যতটুকু বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ততটুকুই বলেছেন। ওপরে 'সুবর্ণ-গোলক' থেকে যে অংশটুকু তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে, 'লোক-রহস্যে'র এই সর্বজনলক্ষ্যতার স্পষ্ট সমর্থন আছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও হাস্য-পরিহাসের সুরে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে, 'বিবিধ প্রবন্ধে' তাঁর সুর গম্ভীর হয়েছে। সে সুর পরে শোনা যাবে। এখন, 'লোকরহস্য' পড়তে পড়তে বাংলা সাহিত্যের ধারায় এই ঠাট্টার সুরের ক্রমায়াত যে প্রবাহটি মনে পড়া স্বাভাবিক, সে সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা যাক।

'বঙ্গদর্শনে'র, অথবা, সেই যুগের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্র-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অনেকের নাম প্রবন্ধরচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমণ্ডিত হয়েছে বটে, তবে, 'লোকরহস্যে'র সঙ্গে পাশাপাশি তুলনা চলতে পারে রাজকৃষ্ণ ও অক্ষয়চন্দ্রের কোনো কোনো লেখার।

আমাদের এ যুগের অধ্যাপকদের লেখা একাধিক বইয়ে লোকরহস্য-জাতীয় রচনার প্রসঙ্গে 'রসরচনা' কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখো যায়। রবীন্দ্রনাথ 'রস-সাহিত্য' কথাটির যে অর্থ ঘোষণা করেছেন, তা তো একটু আগেই বলা হয়েছে।* 'রসরচনা' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে, অথবা আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থবোধে ঐ শব্দের প্রয়োগ-যৌক্তিকতা সম্পর্কে গবেষণা আপাততঃ মুলতবী থাক। 'লোকরহস্যে' যে স্বাদটি বিশিষ্ট, তার অনুরূপ স্বাদ বঙ্গদর্শনের লেখকদের বিচিত্র রচনার মধ্যেও যে বিরল, সেই সিদ্ধান্তই বর্তমানে প্রকাশনীয়। বঙ্কিম-পরবর্তী লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশে

* ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

পরিহাস ফুটেছে বটে,—কোনো কোনো স্থলে পরিহাস-অতিরেকও ঘটেছে—কিন্তু, 'লোকরহস্যের' প্রকৃতির সঙ্গে সেসব রচনার দূর সাদৃশ্যও কষ্টকল্প্য। অন্যান্য গম্ভীর লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু হালকা প্রবন্ধ লিখেছেন,—তবে সেসব লেখাও লোকরহস্য-জাতীয় নয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্কিমী পরিহাসে বরং অপেক্ষাকৃত সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রযুগে ব্রহ্মবান্ধব ছাড়া আর যে-দুজন এই জাতীয় রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁদের একজনের লেখায় নাগরিক বাক্‌চাতুর্য যেমন স্পষ্ট, অন্যজনের রচনায় অর্ধনাগরিক পরিহাসনৈপুণ্য তেমনি সহজদৃশ্য। প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপ্রকৃতি হলো ভিন্নমুখী,—তথাপি এঁদের লেখার স্বাদে অনস্বীকার্য্য এক সাদৃশ্যও আছে। সে সাদৃশ্যের উৎস খুঁজে দেখলে 'লোকরহস্যে' পৌছোনো যায়।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথায়' নিজের বাকচাতুর্যসিদ্ধি স্মরণ করে সেই নৈপুণ্যের নাম দিয়েছেন, 'কৃষ্ণনাগরিকতা'। ইন্দ্রনাথের 'পঞ্চানন্দের' প্রেরণা দিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পঞ্চানন্দের 'আত্মচরিতে'র অবতরণিকা অংশটুকু যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে পঞ্চানন্দের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা বাহুল্য মনে হবে। প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন পরিহাসদক্ষ লেখক,—বাক্‌চাতুর্য এঁদের দুজনেরই অল্পবিস্তর অধিকার-ভুক্ত। ভারতচন্দ্রের প্রভাব ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেও যে এঁরা দুজনেই অল্পবিস্তর লালিত হয়েছিলেন, সে-কথা মনে করা অসংগত নয়। কিন্তু আপাততঃ সে তুলনায় উদ্যত হবার অবকাশ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যের' প্রসঙ্গে এইখানে ছেদ টেনে 'কমলাকান্তে'র কথায় নামা যাক।

ভীষ্মদেব খোশনবীশ কমলাকান্তের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলিই প্রথমে স্মরণ করা যেতে পারে—

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। ···লেখাপড়া না জানিত, এমন নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। ···কমলাকান্তের একবার চাকরী হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি

কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরী রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া আপিসের কাজ করিত না।...একবার সাহেব তাহাকে মাসকাবারে পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিল-বহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন। কমলাকান্তের চাকরী সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখনও দার পরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেকদিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। একদিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া কোথায় চলিয়া গেল।...সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন বলেছেন—

.. as far as mere form goes Kamalakanter Daptar owes much to De Quincey's Confessions of an Opium Eater and Bhismadev Khoshnabish seems to be modelled on Scott's Jedediah Cleishbotham, while the idea of the book (Daptar) having been left by its old author to somebody else through whom it was published is also taken from Scott's plan in the Tales of my Landlord. In addition, there is the element of irrepressible Sam Weller of Dickens in the make-up of Kamalakanta when standing on his trial in the court.*

'কমলাকান্তে' অনুসৃত প্রকরণের দৃষ্টান্ত ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং উৎসাহী, অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকের

---

* Western Influence in Bengali Literature—P.R. Sen, chap. vii.

চোখে হয়তো আরো বেশি সংখ্যায় ধরা পড়তে পারে। সেই প্রকরণগত সাদৃশ্যের গবেষণা প্রসঙ্গে পণ্ডিতরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে Addison, Steele, Leigh Hunt প্রভৃতি লেখকদেরও নাম করেছেন। Addison ও Steele বিদ্রূপসমন্বিত সমালোচনায় দক্ষ ছিলেন। Leigh Hunt-এর 'The cat by the fire' নামক প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধের হুবহু অনুরূপ বললে অত্যুক্তি হয়না। বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনভঙ্গির বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু রচনার সাদৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তথাপি 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই সব প্রভাবের দৃষ্টান্ত বলেই যে প্রধানতঃ স্মরণীয়, তা নয়। 'কমলাকান্ত' বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয়, চিরজীবী, চিরশক্তিমান, একটি চরিত্র,—কালসীমাতিশায়ী একটি ভাব বা 'idea,'—বর্তমান কালের লেখক-পাঠক-শ্রোতা নির্বিশেষে কমলা-কান্তকে একটি সিদ্ধরসাশ্রয় ও ভাবসত্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্যটি স্মর্তব্য; তিনি বলেছিলেন, 'কমলাকান্ত একটি শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র; সেই দিক দিয়া বিচার করিলে কমলাকান্ত অনন্যসাধারণ'।§ এ মন্তব্য যে ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিত নয়,—একাধিক সুধী ব্যক্তি যে এই ধারণা পোষণ করেন, তার নজির পাওয়া গেল হাল আমলের একখানি বইয়ের স্তুতিমালায়। ১৩৩৪-এ শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় এম. এ. মহাশয় লেখকের নাম গোপন রেখে 'কমলাকান্তের পত্র' নামে যে বইখানি প্রকাশ করেছিলেন, সে বইয়ের প্রশংসাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সম্পর্কে নীচের মন্তব্যগুলি পাওয়া গেছে:

অহিফেনামৃত পান করিয়া কমলাকান্ত ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন।··· [মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ়, ১৩৩৩]

কমলাকান্ত মানুষ নহে—ভাব, আমাদের জাতীয় ভাব। জাতির চিন্তার খাঁটি দুগ্ধে তাহার পুষ্টি। সে এই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা জননী জন্মভূমির বুকের ধন। বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিয়া সে আত্মবিকাশ করে। তাহার আত্মবিকাশের সন্ধান পাইয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র। তখন বঙ্কিমমণ্ডলের অন্যান্য সাহিত্যিক-

§ বঙ্কিমচন্দ্র: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

কেও সেই ভাবের ভাবুক হইতে দেখা গিয়াছিল—যথা অক্ষয়চন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ। সে সব ভাবের অভিব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র দপ্তরে বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু এই যে কমলাকান্ত ভাব ইহা সকলকে ধরা দেয় নাই। তাই সাহিত্য-চন্দ্র-চকোর চন্দ্রশেখরের চেষ্টাও 'মসলাবাঁধা কাগজে' পরিণত হইয়াছিল।...

[দৈনিক বসুমতী, ১০ই মাঘ, ১৩৩১]

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যদি একটি মানুষ হতো তো এতকাল ধরে সে বেঁচে থাকতেই পারতো না—কিন্তু সে নাকি একটা ধূমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে। বঙ্কিমের যুগে এই ঝাঁটা একবার দেশের উপরে পড়েছিল।...

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ভারতী, ফাল্গুন, ১৩৩০]

এই জাতীয় মন্তব্য সংখ্যায় অগণ্য। কিন্তু উদ্ধৃতির বাহুল্যে বর্তমান বইয়ের কলেবর বাড়িয়ে লাভ নেই। ওপরের স্বীকৃতিগুলির সূত্রে 'কমলাকান্ত' সম্পর্কে আজ থেকে বছর তিরিশেক আগেকার বাঙালী পাঠকের অভিমত জানা গেল। এঁদের এইসব কথা থেকে ন্যূনপক্ষে, কমলাকান্তের এই ক'টি গুণের উল্লেখ পাওয়া গেল:—প্রথমতঃ কমলাকান্ত অমর, দ্বিতীয়তঃ খাঁটি বাঙালী, তৃতীয়তঃ তিনি ধূমকেতুসদৃশ,—অর্থাৎ, বাঙালীর মনোগগনে কমলাকান্ত হলেন নিত্যস্থায়ী, কিন্তু বিরলপ্রকাশ,—যখন আসেন, তখন, তাঁর ভয়াবহ আলোর ঝাঁটায় মনের এবং অভ্যাসের গ্লানি ঝেঁটিয়ে দিযে যান।

সুধীজনের মন্তব্য শ্রদ্ধার্হ। অবনীন্দ্রনাথ কমলাকান্তকে বলেছেন, ধূমকেতু। তবে, আমার মনে হয়, এই ধূমকেতু বাংলার আকাশে একটিবার মাত্র দেখা দিয়েই মহাপ্রয়াণ করেছেন। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' ছিলেন অদ্বিতীয় চরিত্র—বঙ্কিমের আবাহনেই তিনি সাড়া দিয়েছিলেন,—তারপর, আর আসেন নি; শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়, এম. এ.-প্রকাশিত 'কমলাকান্তের

পত্রে'ও তাঁর খাঁটি স্বাক্ষরটি পড়েনি,—সে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পর্যালোচকেরা যাই-বলুন-না-কেন। বঙ্গসাহিত্যে সেই ধূমকেতুর পুনরাবাহনের চেষ্টা মাঝে মাঝে ঘটেছে।

কমলাকান্তের অনুকরণ অনেকে করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীশঙ্করাচার্য বঙ্গদেশীয় রচনায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর রোজনামচায়,' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'মহাপূজা', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থে, এবং একালে, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) প্রভৃতি সাহিত্যিকদের কলমে কমলাকান্তের ভর হয়েছে বৈ কি! তবে, মূল কমলাকান্ত একজনই—তিনি আদি এবং অকৃত্রিম,—তাঁর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। একালে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাঁরা কমলাকান্তের ভর পেয়ে কলম ধরেছেন, তাঁদের অনেক লেখার মধ্যে চারুচন্দ্র রায়ের 'ভদ্রলোক', 'Democracy না ধামা-cracy,' 'বহুবচন' প্রভৃতি রচনা, জ্যোতির্ময় ঘোষের 'চ্‌ৗ'-র মতো গল্প, রাজশেখর বসুর 'নামতত্ত্ব', 'তিথি' প্রভৃতি প্রবন্ধ একই অনুষঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে লিখতে বসে এই আলোচনার সূচনায় De Quincey-প্রবর্তিত সাহিত্যের শ্রেণীমিথুনের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর প্রসঙ্গতঃ, রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি থেকে 'রসসাহিত্য' শব্দটির অর্থোল্লেখও ঘটেছে। এখন, শ্রীযুত নবেন্দু বসুর একটি উক্তি স্মরণ করা যাক:

> সাহিত্যিকতার দিক থেকে সাহিত্যকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম তথ্য-সাহিত্য; দ্বিতীয় রসসাহিত্য; তথ্য-সাহিত্য তাই যার উদ্দেশ্য কোন বস্তুজগতের কোন সংবাদ বহন করা।···রসসাহিত্যের বিষয় যাই হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য সংবাদ দেওয়া নয়। ···রসসাহিত্যের মূল লক্ষণ আর মাপকাঠি হল আবেগের অনুভূতি থেকে আনন্দ বোধ করা বা চিত্তের বিনোদন হওয়া। রসসাহিত্যেও তথ্যের বিষয়বস্তু থাকে, আর তার সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা ব্যক্ত করেই, গদ্যে হোক বা কাব্যে হোক, সে সাহিত্যের রচনা হয়ে থাকে।*

* রসসাহিত্য—নবেন্দু বসু—পৃঃ৩-৪

'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'—এই উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যের বহুলতা অনস্বীকার্য,—তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যবস্তু যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। লেখক সংবাদ দিতে বসে আনন্দ পরিবেশন করেছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে, এরকম সাহিত্যকে কোন্ শ্রেণীতে জায়গা দেওয়া যাবে? De Quincey-র দুটি বিভাগেরই গুণ এতে আছে,—বাংলায় 'রসসাহিত্য' এবং 'তথ্যসাহিত্যে'র যে বিভাগের কথা বলা হলো, সেই দুটি বিভাগেরই আমন্ত্রণে এই রচনাগুলি যুগপৎ সাড়া দিতে পারে ; কারণ, 'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্ত'—দুই-ই হলো তথ্য এবং রসের হরগৌরী অভিব্যক্তি। ব্যাপারটি বুঝে দেখতে হলে আরো একটু বাগ্‌বিস্তার আবশ্যক। বিশুদ্ধ 'রসসাহিত্য' এবং অবিমিশ্র 'তথ্যসাহিত্যে'র দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি? নবেন্দু বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'তথ্য-সাহিত্য' নামটিতে মন খুঁৎখুঁৎ করা স্বাভাবিক। কারণ, তথ্য যখন সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়, তখন, সেই রূপায়নই তো রসায়নের নামান্তর। তথ্য যখন রসাত্মক বাক্যে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তা 'সাহিত্য' পদবাচ্য হয়।

আবার, রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য সত্ত্বেও 'রসসাহিত্য' কথাটিও কি বাগ্‌বাহুল্যের দৃষ্টান্ত নয়? 'সাহিত্যরস' কথাটা যেমন স্পষ্ট ভাববহ, 'রসসাহিত্য' কথাটা তেমন নয়। আমরা সাহিত্যের রস অনুভব করি,—কিন্তু, রসের সাহিত্য কোন্ বস্তু? 'রসসাহিত্য' পদটি তৎপুরুষ সমাসেও অনর্থসূচক, কর্মধারয়েও অচল। রবীন্দ্রনাথ ও-কথার যে-অর্থ ঘোষণা করেছেন, তাতে ব্যাপারটি আর দুর্বোধ্য থাকেনি,—বোঝা গেছে যে, ওখানে তথ্যপরিমাণের একটি আপেক্ষিকত্ব নিহিত আছে। যে সাহিত্যে তথ্যের প্রাধান্য, তাকে নবেন্দু বসু বলেছেন, 'তথ্যসাহিত্য,'—আর যে-সাহিত্যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞানলাভের চেয়ে আত্মবিষয়ে উপলব্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন, 'রসসাহিত্য'। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণের কথা' যদি হয় 'তথ্য-সাহিত্যে'র নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম'-কে তাহলে অবশ্যই বলা যাবে 'রসসাহিত্যে'র দৃষ্টান্ত। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এই তিনখানি বইয়েরই প্রেরণা জুগিয়েছে,—, অবিমিশ্র তথ্যের অবরোধে এই তিন লেখকের মধ্যে একজনও বাঁধা

থাকেননি,—ভিন্ন ভিন্ন তথ্যপ্রসঙ্গ উপলক্ষ করে অস্মিতাবোধে এঁরা সকলেই উত্তরণনিষ্ঠ। এবং, এই উত্তরণসাফল্যে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অপরিমেয়, রাখালদাসের—অসামান্য, রামেন্দ্রসুন্দরের—স্বল্পমিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলা কান্তের দপ্তর' রসোত্তীর্ণ হলেও রবীন্দ্রনাথ যাকে 'রসসাহিত্য' বলেছেন, সে-পর্যায়ে স্থান পায় না; বরং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া নামটিই এ ক্ষেত্রে বেশ লাগসই মনে হয়। শ্রীকুমার বাবু এ-বইখানিকে বলেছেন, 'রসসন্দর্ভ' এবং এই সংজ্ঞার অনুসরণ করে আরো বিশদ ভাবে লিখেছেন,

'কমলাকান্তের দপ্তর একটি তান-লয় শুদ্ধ সঙ্গীতের মত আমাদের রসবোধকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করে।*

'কমলাকান্তের দপ্তর' নানা তথ্যের স্মারক;—বিভিন্ন আধিভৌতিক প্রসঙ্গে এ রচনা অভিনিবিষ্ট। কয়েকটি দপ্তরের আলোচনা লক্ষ্য করলেই এ-বিষয়ে সন্দেহ দূর হবে।

প্রথম দপ্তরের নাম, 'একা'—কমলাকান্ত সেখানে বলেছেন, 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' দ্বিতীয় দপ্তর 'মনুষ্য-ফল,'—সেখানে বলা হয়েছে, 'মনুষ্যসকল ফলবিশেষ,'—বিত্তশালী সমাজবরণ্যে ব্যক্তিরা হলেন 'কাঁঠাল', সিবিলিয়ান সাহেবেরা 'আম', স্ত্রীলোকেরা 'নারিকেল', ভণ্ড দেশহিতৈষীরা 'শিমূল', অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা 'ধুতূরা', বাঙালী লেখকবৃন্দ 'তেঁতুল' এবং দেশী হাকিমেরা 'পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড'। দশম দপ্তর 'বড়বাজার'-এ বলা হয়েছে, 'এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি।' ত্রয়োদশ সংখ্যক দপ্তরে 'বিড়াল' প্রসঙ্গে বিতর্কের প্রধান বিষয় হলো এই: 'অধর্ম চোরের নহে—চোর যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?'

এইভাবে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র তথ্যকথা উপলক্ষ করে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' মানবসমাজের স্থায়ী-অস্থায়ী, প্রাদেশিক অথবা সার্বিক সমস্যা-সংশয়ের আলোচনা ঘটেছে। 'লোকরহস্যে'ও যে তাই হয়েছে,—সে তো ইতঃপূর্বেই দেখা গেছে।

* 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'

এই কারণেই অনেকে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'লোকরহস্য' সংবাদিকতার ছোটো গণ্ডি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-ও অনেকাংশে সেই পক্ষস্তরাসীন রচনা। এ অভিযোগের বিচার তর্কবুদ্ধির রাজদ্বারে সম্ভব হবে না। কারণ, বিচার-বিশ্লেষণ করে উপাদানাবলীর তালিকা তৈরি করা চলে,—তার অতিরিক্ত দাবী তর্কবুদ্ধিতে মেটানো সম্ভব নয়। রসোপলব্ধির ক্ষমতা হলো অন্য ধরণের জিনিস। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এবং 'লোকরহস্যে' ব্যবহারিক জীবনের, প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের অনেক কথাই বলা হয়েছে বটে, কিন্তু, অবিমিশ্র তথ্যসর্বস্বতা তো এই দুই গ্রন্থের ফলশ্রুতি নয়। অষ্টম দপ্তর 'স্ত্রীলোকের রূপ' অথবা একাদশ দপ্তর 'আমার দুর্গোৎসব' পড়বার সময়ে পাঠকের রসপিপাসা কি অতৃপ্ত থাকে? 'স্ত্রীলোকের রূপ' অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন নি,—লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া, 'চন্দ্রলোকে' নামক প্রবন্ধটিও বঙ্কিমের নয়,—সেটি লিখেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

'লোকরহস্য,' 'কমলাকান্ত' এবং 'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত'—এই তিনটি কৌতুকরসাশ্রিত, তথ্যবহুল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং গ্রাম্যতাবর্জিত রচনায় শ্রেয়স্কাম, শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রেরই স্বাক্ষর পড়েছে। সমস্ত বাঙালী জাতের,—অথবা আরও ব্যাপক ভাবে বলা যায় যে, সারা ভারতের বেদনার কথা এই সব লেখায় হাসির রসে জরিয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দীপ্ত চোখ এবং চাপা ঠোঁটের ব্যক্তিত্বময়তা এই সব রচনার ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত বিদ্বেষবর্জিত, জ্বালাহীন ব্যঙ্গরসে উনিশ শতকের ভারতীয় রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্মনীতি-সাহিত্যপ্রীতি ইত্যাদি যাবতীয় মানসকৃত্যের আপাতলঘু, ফলতগভীর পর্যালোচনা করে গেছেন তিনি। প্রকরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র De Quincey-র কাছে কি পরিমাণ ঋণী ছিলেন, অথবা Leigh Hunt-এর কাছে কতোদূর প্রেরণা পেয়েছিলেন,—সে-আলোচনা রসোপভোগের পক্ষে অবান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনার (তাঁর 'ললিতা ও মানস' এই মন্তব্যের একমাত্র ব্যতিক্রম) সম্পর্কে যে কথাটি খাটে,—এই লেখাগুলির সম্পর্কেও সেই কথাটিই স্মরণীয়;—কথাটি হলো এই যে, তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁর রচনাবলীর বিষয়বৈচিত্র্যমাত্র নয় প্রকরণসৌকর্যমাত্রও নয়—আসল কারণটি হলো তাঁর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব। এতবড়ো ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ

ছাড়া আর তৃতীয় কোনো লেখকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেনি। 'লোকরহস্যে' সেই অপরিসীম ব্যক্তিত্বময় বঙ্কিমচন্দ্র হালকা সুরে সামরিক ও সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিলেন,—'কমলাকান্তে' প্রসন্ন গোয়ালিনী, নসীরাম বাবু, ভীষ্মদেব খোসনবীশকে অবলম্বন করে তাঁর পর্যালোচনামালা অর্ধ-ঔপন্যাসিক রমণীয়ত্বে উন্নীত হয়েছে।‡ তারপর 'বিবিধ প্রবন্ধে' তিনি গম্ভীর সুরে নতুনতরো আলোচনা সুরু করেছেন। আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামে যে মাতৃপূজার আয়োজন সার্থক হয়েছে, কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'ই তার প্রথম উদ্বোধন ঘটেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কথা অকাট্য :

'আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি 'মৃণালিনীতে' যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ।. আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।*

তথ্যবৈচিত্র্যের অভিনবত্বে, আঙ্গিকের কৌশলে—সর্বোপরি, এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রসাদে 'কমলাকান্ত' বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এই 'দপ্তরের' আলোচনাকালে লিখেছেন :—

রচনাগুলির মধ্যে তিন প্রকারের পরম্পরাই (sequence) দেখা যায়,— 'আমার দুর্গোৎসব,' 'কে গায় ওই,' ইত্যাদি নিবন্ধের

---

‡'কমলাকান্ত' নামে অহিফেনসেবী লোকটির আবির্ভাবের হেতু নির্দেশবলে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি স্মরণীয় :—

'বঙ্কিম যে সমাজসংসারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেই যে ব্যক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সে তাহারই অঙ্গীভূত। সেই সমাজ সংসারের সুখ দুঃখ সাধারণ সংস্কারের দ্বারা তাহার চিত্ত অভিরঞ্জিত। তাহার দ্বারা এইরূপ সমালোচনা স্বাভাবিক নয়। সে অধিকারীও নয়। সেই অধিকার অধিগত করিবার জন্য তিনি নিজেকে তাহার বাহিরে দাঁড় করাইয়াছেন একজন নিরপেক্ষ অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে।'

—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় : কালিদাস রায় ; পৃঃ ২০৯।

* সাহিত্যসাধক চরিতমালা—২২ ; পৃঃ ৬০।

পরম্পরা আবেগাত্মক (emotional)। 'একটি গীত' নিবন্ধে কমলাকান্ত ব্যাখ্যাতা সাজিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার পরম্পরা ঠিক ব্যাখ্যার নব, ইহার পরম্পরাও আবেগাত্মক। 'স্ত্রীলোকের রূপ,' 'চন্দ্রালোক' ইত্যাদি রচনার পরম্পরা যুক্তিমূলক (logical)। 'বড়বাজার,' ঢেঁকি,' ইত্যাদি নিবন্ধের পরম্পরা আলঙ্কারিক (rhetorical)। রূপকমালার ক্রম অনুসারে এইগুলি রচিত হইয়াছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কতকগুলি প্রবন্ধে লেখক 'জীবনকে এক একটা প্রবল, সর্বব্যাপী, হাস্যকর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কল্পনার' ভেতর দিয়ে দেখেছেন এবং তার ফলে, 'জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত' বলে প্রতিভাত হয়েছে। 'মনুষ্য-ফল', 'পতঙ্গ', 'বড়বাজার', 'বিড়াল', 'ঢেঁকি', ইত্যাদি হলো এই শ্রেণীর রচনা। অন্য কতকগুলি প্রবন্ধে 'প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গ, যৌবনের শেষে অবসানের তীব্র অনুভূতিময় বিশ্লেষণ' দেওয়া হয়েছে। 'একা', 'আমার মন', ও 'বুড়া বয়সের কথা' এই জাতীয় রচনা। 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' শ্রেণীর রচনায় 'সংস্কৃত সূত্র ও ভাষ্যের রচনাপ্রণালীর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ' ঘটেছে। এই তৃতীয় বিভাগটি কেবল যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' সম্পর্কেই স্মরণীয়, তা নয়;— 'লোকরহস্যে'র দাম্পত্য-দণ্ডবিধির-আইন অংশও এই শ্রেণীতেই স্থান পাবে— সেখানেও ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ ঘটেছে, তবে সংস্কৃত কোনো সূত্রের বা ভাষ্যের নয়,—ইংরেজি আইনী ভাষার। শ্রীকুমার বাবুর বিশ্লেষণ অনুসারে এই রচনাবলীর চতুর্থ শ্রেণী বিভাগটির লক্ষণ হলো fantasy ধর্ম; 'বসন্তের কোকিল' ও 'ফুলের বিবাহ' এই শাখায় স্থান পাওয়া উচিত। পঞ্চম শ্রেণীতে স্থান পাবে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'। এই দুটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি 'দীর্ঘকালরুদ্ধ আবেগের আকস্মিক নিষ্ক্রমণ' লাভ করেছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শিত কমলাকান্তের এই

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় : কালিদাস রায়; পৃঃ ২১০।

পঞ্চবিভাগ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের বহু শ্লাঘনীয় একটি উক্তি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করা যাক। কমলাকান্তের সর্বগুণের পরিচয় দিতে গিয়ে সুবোধচন্দ্র বীজমন্ত্রের মতো সংহত ভাষায় বলেছেন,

সুইফট্-এর অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণু শর্মার কল্পনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

সুইফ্‌ট্ এবং বিষ্ণুশর্মা দুজনেই কলম ধরেছিলেন ব্যক্তি ও সংঘের কল্যাণ সাধনের তাগিদে। তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টাই বাগ্‌দেবীর স্থায়ী অনুমোদন লাভ করে বৃহৎ মানবসমাজের মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে উঠেছে। কমলাকান্ত এই দুই কৃতী লেখকের বিশিষ্টতার লক্ষণগুলি সত্যিই আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলে যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে, De Quincey-র প্রচারিত সাহিত্যের দুটি বিভাগের মধ্যে কোন্‌টিতে তাঁর স্থান হবে, সে-প্রশ্ন অবান্তর। তাহলে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আর বাধা নেই যে, 'কমলাকান্ত' literature of knowledge এবং literature of power,—এই দু'য়েরই হরগৌরী-মূর্তি। শুধু উপাদানের জন্য নয়,—কেবল প্রকরণের চারুত্বগুণেও নয়,—কমলাকান্তের খ্যাতি ও সার্থকতার কারণ হলো উপাদান ও প্রকরণের উদ্বাহসমন্বয়,—তথ্য ও রসের অব্যবহিত মিলন।‡

* ১০১-এর পৃষ্ঠায় 'শকার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের নানা বিদূষকের মধ্যে অন্যতম; সে বিদূষক নয়—স্বভাবলম্পট মূর্খ রাজশ্যালক মাত্র'—এই উক্তিটির শেষের বিদূষক-শব্দটি উদ্ধৃ-কমা চিহ্নিত হওয়া উচিত,—অর্থাৎ, 'বিদূষক'-রূপে পঠনীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'শকার', 'বিট', 'বিদূষক'—এঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর দূষণক্ষম ব্যক্তি—অর্থাৎ পরের দোষ দেখা এঁদের স্বভাব। তবে প্রকৃত 'বিদূষক' হলেন বিজ্ঞ, বিদগ্ধ, ব্রাহ্মণ রাজানুচর,—'বিট' হলেন ধূর্ত ব্রাহ্মণ,—এবং 'শকার' হলেন মূর্খ রাজশ্যালক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কোনও স্পেশিয়েলের পত্রে' পাশ্চাত্য পণ্ডিতমন্য ব্যক্তিদের বিদূষণ-বৃত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে 'শকার', 'বিট' ও 'বিদূষক'—এই তিন চরিত্রের দূষণস্বভাবের সাধারণ লক্ষণগুলির দ্বারা হয়তো কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন,—এই হলো বর্তমান আলোচকের অনুমান।

ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর পক্ষপাতিত্ব ছিলো 'ক্ল্যাসিক্যাল' আদর্শের প্রতি। ফলে, পক্ষপাতশূন্য পরিচ্ছন্ন এক মননপ্রকৃতির তিনি অধিকারী হতে পেরেছিলেন,—আত্মপ্রাধান্যময় রোম্যাণ্টিক মনোভাবের প্লাবনের মধ্যে বাস করেও তিনি আত্মসর্বস্বতা পরিহার করেছিলেন। অবশ্য, তাঁর ব্যক্তিগত ঝোঁক তাঁর রচনার কোনো অংশেই যে আদৌ না পড়েছে, তা নয়। শেলীর কাব্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা পড়ে তাঁর পাঠকের পক্ষে তাঁর পক্ষপাতশূন্যতার তারিফ করা সহজ নয়। কিন্তু, এরকম দু'একটি দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও 'ক্ল্যাসিক্যাল' আদর্শের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিলো নির্ভেজাল। সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো এই কারণেই। প্রাচীন গ্রীসের সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন যে, এথেন্সের অধিবাসীরা ছিলেন উদারচিত্ত, নমনীয়বুদ্ধিসমৃদ্ধ একটি জাতির উপাদান; আধুনিক (ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের সমসাময়িক) ফরাসী জাতির মধ্যে এই দু'টি গুণ, অর্থাৎ চিত্তের ঔদার্য এবং বুদ্ধির নমনীয়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের দিকে ইংরেজদের দৃষ্টি ফেরানো দরকার।* Culture-কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলে গেছেন যে, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন বা অবস্থা সম্পর্কে জগতে শ্রেষ্ঠ যা কিছু ভাবা হয়েছে, বলা হয়েছে, লেখা হয়েছে—সে-সমস্ত তত্ত্ব-তথ্যের জ্ঞান আহরণ করে আমাদের অভ্যস্ত মতামতের এবং সংস্কারের যান্ত্রিক শাসন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যই Culture দরকার। এই অর্থে Culture শুধু বিদ্যার সঞ্চয় নয়, বিদ্যার ব্যবহার।* বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'অনুশীলনধর্মে' এই কথাটিই বলে গেছেন। মানুষের শক্তিপুঞ্জের তিনি যে চারটি শ্রেণী-বিভাগ করে গেছেন, 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি সেগুলিকে এক একটি 'বৃত্তি' নামে অভিহিত করেছেন,—এই চারটি বৃত্তির নাম: শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী,

* Literary Influence of Academies—M. Arnold.

* Culture and Anarchy—M. Arnold.

কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। এই চাতুর্বিধ্য প্রতিপন্ন করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মানুষ্যের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা—পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।

মানুষের সর্বশক্তির সুসমঞ্জস সার্বিক সমন্বয়ের চেষ্টাই যে culture-এর লক্ষ্য, একথা ম্যাথ্যু আর্নল্ডও স্বীকার করেছেন। লেসিং এবং হার্ডার, —জার্মানীর এই দুই মহারথীর প্রশংসা করে এদের কৃতিত্বের হেতু নির্দেশ কালে তিনি বলেছেন—Because they humanised knowledge; because they broadened the basis of life and intelligence; because they worked powerfully to diffuse sweetness and light, to make reason and the will of God prevail.

বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেচেন 'সুখ'—ম্যাথু আর্নল্ড তাকেই বলেছে 'sweetness and light'। আর্নল্ডের নিজের কথাগুলিই তুলে দেখা যাক,

Culture looks beyond machinery, culture hates hatred; culture has one great passion, the passion for sweetness and light. It has one even yet greater!—the passion for making them prevail.

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিষয়ে আলোচনার সূচনায় Matthew Arnold-এর নামোল্লেখের কারণ আছে। প্রথম কারণটি হলো 'বিবিধ প্রবন্ধের' তথ্যগত; দ্বিতীয়টি, প্রকাশ-কালগত। এর আগের আলোচনার শেষে 'কমলাকান্ত' সম্পর্কে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের যে সংহত মন্তব্যটি দেওয়া হয়েছে, 'বিবিধপ্রবন্ধে'র সার্বিক পরিচয়ের ওপর আলোকপাতে সমর্থ পূর্বসূরীদত্ত সে-রকম কোনো মন্তব্য চোখে পড়েনি। সে জাতীয় কোনো মন্তব্য হাতে থাকলে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু-বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ না করলেও চলতো। কিন্তু তা' যখন হাতে নেই তখন বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৮৭-র জুলাই মাসে,—দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২-এ। প্রথম ভাগটি, পূর্ববর্তী দু'খানি বইয়ের সমাহার।—'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) এই দু'খানি বইয়ের নবকলেবর। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে দ্বিতীয় ভাগটি সম্পাদিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাবে পর পর দুটি খণ্ডের বিষয়সূচী থেকে :—উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প, দ্রৌপদী (১ম ও ২য় প্রস্তাব), অনুকরণ, শকুন্তলা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা (১ম ও ২য়), বাঙ্গালীর বাহুবল, ভালবাসার অত্যাচার, জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, প্রাচীনা ও নবীনা—এই হলো প্রথম ভাগের বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে' এবং 'প্রচারে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের বিষয়সূচী :—ধর্ম এবং সাহিত্য, চিত্তশুদ্ধি, গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি (তিনটি প্রস্তাবে সম্পূর্ণ), কাম, বাঙ্গালা নব্য লেখকদিগের প্রতি, ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা, সঙ্গীত, বঙ্গদেশের কৃষক (চার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ), বহুবিবাহ, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (দুই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ), বাঙ্গালা শাসনের কল, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর উৎপত্তি (সাত পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ), বাহুবল ও বাক্যবল, বাঙ্গালা ভাষা, মনুষ্যত্ব কি, লোকশিক্ষা এবং রামধন পোদ।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র এই দুটি খণ্ডের সঙ্গে 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫) 'সাম্য' (১৮৭৯) এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের বঙ্কিম-রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডটি একত্র আলোচিত হওয়া সমীচীন। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র 'বঙ্কিমচন্দ্র'-পুস্তিকার যুগ্ম-সম্পাদক বলেছেন, 'এই প্রবন্ধগুলি পাঠে যোদ্ধা বঙ্কিমের একটা রূপ পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে; সে রূপ শুধু স্রষ্টার নয়—পালকেরও।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলীর বিভিন্ন অংশে জন স্টুয়ার্ট মিল, ফিক্টে, হার্বার্ট স্পেন্সার, সৌলি, ক্যাণ্ট, লক্, হিউম, জেরেমি বেন্থাম, ডারুইন, অগস্ত কোম্‌ত্, বার্ক, মেকলে, ম্যাক্সমুলার, রসায়নাচার্য বাক্, বৈজ্ঞানিক কাবালো,

স্তার্ জন্ হার্শেল ইত্যাদি বহু পাশ্চাত্ত্য ধীমানের উল্লেখ করেছেন। Mill-এর Utilitarianism প্রকাশিত হয় ১৮৬২-তে ; Bentham-এর Principles of Morals and Legislation ১৭৮০-তে, এবং Introduction to the Principles of Morals and Legislation ১৭৮৯-তে। ১৮৭৩-এ Mill-এর মৃত্যুর পরে 'বঙ্গদর্শনে' (বৈশাখ ১২৮২) বঙ্কিমচন্দ্রের 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম' প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধের' দ্বিতীয় ভাগে এই প্রবন্ধটিই 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে'—নামে সংকলিত হয়। সমসাময়িক বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি যে কতো সজাগ ছিলেন, এইসব উল্লেখ-আলোচনাই তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। বলা বাহুল্য, এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। তবে, এখানে সে রকম উদ্যম নিষ্প্রয়োজন্।

এ থেকে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর Culture and Anarchy এবং Last Essays on Church and Religion-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। Culture and Anarchy ছাপা হয় ১৮৬৯-এ, Last Essays on Church and Religion ১৮৭৭-এ,—পর্যালোচনামূলক গদ্যসংকলন Essays in Criticism ১৮৬৫-তে। অনুমানটি দৃঢ়তর হয় 'ধর্মতত্ত্বে'র প্রথম অধ্যায়ে পৌঁছে। 'অনুশীলন'-এর রচনাগুলি গ্রন্থভুক্ত হয় ১৮৮৮-তে,—তার আগে ১২৯১-৯২-এর 'নবজীবনে' 'এই গ্রন্থের কিয়দংশ' ছাপা হয়েছিল।

'ধর্মতত্ত্বে'-র প্রথম অধ্যায়ের গুরুশিষ্য-সংবাদে গুরু বলেছেন, 'Culture বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ'। এবং এই তত্ত্বটি বিশদ ভাবে আলোচনার পূর্বে গুরু আবার বলেছেন,

> …তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতি অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ।

ব্যক্তিগত পঠনসূত্রে যাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ম্যাথ্যু আর্নল্ড যে তাঁদের অন্যতম ছিলেন, সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেল। কারণ, ঘনিষ্ঠতা না থাকলে তিনি কখনোই এমন মন্তব্য করতেন না। তাঁর দায়িত্বজ্ঞান এবং কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবচনের মতো সুবিদিত।

Culture and Anarchy-র 'অনুশীলন'বাদের বিপক্ষে তাঁর বক্তব্য তিনি বিশদভাবে বলেন নি ; তবে, উক্ত লেখক সম্পর্কে তাঁর মনে যে উৎসাহমান্দ্য

ঘটেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ, আশ্চর্যের কথা এই যে, কোনো কারণ উল্লেখ না করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য কোনো মনীষীর কোনো কথাই তিনি এভাবে কখনো বাতিল করেননি। যাঁদের তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের সম্পর্কেও তাঁর অহেতুক বাক্-কার্পণ্য কখনো ঘটেনি।

শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্বৃত্তির 'অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব'—এই ছিলো তাঁর 'অনুশীলন ধর্মের' মূল কথা। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড বলেছেন,

Culture is then properly described not as having its origin in curiosity, but as having its origin in the love of perfection ; it is *a study of perfection.*

আর্ণল্ডের 'culture' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন'—আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে লক্ষ্যগত কোনো বিভেদ নেই বলেই মনে হয়। তবে দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্মতর ভেদ থাকা অসম্ভব নয়—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যখন বিশেষ ভাবে নামোল্লেখ করে অমন একটি কটাক্ষ করেছেন! হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানিতে এই সূক্ষ্ম ভেদের ব্যাখান পাওয়া যাবে বলে আশা ছিলো। কিন্তু সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাগুক্ত কটাক্ষের কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি। হীরেন্দ্রনাথ একটি ব্যাপক মন্তব্য করে জানিয়েছেন :

'বঙ্কিমচন্দ্র একথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য অনুশীলন ধর্মের লক্ষ্য সুখমাত্র, কিন্তু তিনি যে ভারতীয় অনুশীলন-তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিয়াছেন, যাহা তাঁহার মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা যে অনুশীলন-তত্ত্বের উপর গঠিত, সে অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি। ঐ মুক্তি সুখমাত্র নহে—উহা আত্যন্তিক সুখ (গীতা), বিপুলং সুখং (ধম্মপদ) এবং উপনিষদের ভাষায় আনন্দং নন্দনাতীতম্। বঙ্কিমচন্দ্র, এই ভূমানন্দের (বৃহদারণ্যকে যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' বলা হইয়াছে) ইঙ্গিত করিয়াছেন—বিস্তার করেন নাই।'

কেবল প্রকাশকালের সামীপ্য দেখে 'বিবিধ প্রবন্ধ' এবং 'Culture and Anarchy' এই দুই গ্রন্থের মধ্যে আদর্শগত কোনো নৈকট্য বা আত্মীয়তার সিদ্ধান্তে পৌছোনো সংগত নয়। এই দুই লেখকের মনোগঠনে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য দুই-ই যে চোখে পড়ে, সে কথা স্বীকার্য। ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের পক্ষে তাঁর

গদ্য-রচনার গুণগনার তুলনায় কবিখ্যাতিও বিশেষ কম হয় নি,—পক্ষান্তরে বঙ্কিমের 'ললিতা ও মানস' অতিশয় কাঁচা পদ্য; ম্যাথ্যু আর্ণল্ড কিছু দিন শিক্ষাবিভাগে পরিদর্শকের কাজ করেছিলেন,—বঙ্কিম কলেজ ছেড়ে বরাবর ইংরেজ সরকারের হাকিমী করেছেন; বঙ্কিমচন্দ্র হলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম চমকপ্রদ ঔপন্যাসিক,—ম্যাথ্যু আর্ণল্ড একখানিও উপন্যাস লেখেননি;—এই রকম আরো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে সাদৃশ্যও বিরল নয়। সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে আপন আপন ক্ষেত্রে দুজনেই আপন-আপন কালের নেতৃত্ব করে গেছেন। তাছাড়া হৃদয়-মস্তিষ্কের সমীকরণের চেষ্টায় জীবনব্যাপী আন্তরিকতার গুণেও এঁরা ছিলেন সমধর্মী।

উনিশ শতকের এই দুই মহারথীর মতামতের তুলনামূলক আলোচনা একটি চিত্তাকর্ষক দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্য দীর্ঘ শ্রম, বিপুল অধ্যবসায় এবং ব্যাপক বিদ্যার মূলধন অবশ্যকাম্য। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধের পাত্রে সে জিনিষ পরিবেষণ করা সম্ভব নয়। এখানে প্রধানতঃ 'বিবিধ প্রবন্ধের' ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাঁর স্বাজাত্যবোধ, ধর্মবোধ, সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে তাঁর প্রদর্শিত মূল সূত্রগুলি এবং হৃদয়-মস্তিষ্কের সমীকরণ-তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাক।

'বিবিধ প্রবন্ধের' প্রথম খণ্ডে 'জ্ঞান', 'সাংখ্যদর্শন', 'প্রাচীনা ও নবীনা' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য', চিত্তশুদ্ধি' প্রভৃতি কয়েটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর 'অনুশীলন' পুস্তকে দেখা যায় যে ধর্মসাধনায় ভক্তির বিশিষ্ট স্থান তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই'।—উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ ও আত্মজ্ঞান সাধন—'শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রেই আমরা প্রথম ভক্তির উল্লেখ পাই'। বঙ্কিমচন্দ্রের এইসব মতামত সূক্ষ্ম প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে,—দার্শনিকের তর্কবিতর্কে, অথবা ঐতিহাসিকের নিখুঁৎ তথ্যজ্ঞানের আক্রমণেও যে সর্বত্র অটুট থাকবে, তা মনে হয় না। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর 'উপনিষদে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে, 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক গ্রন্থে এইসব মতামত বিচার করেছেন। তাছাড়া 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র'-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েও এ-বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে; তিনি নিষ্কাম ভক্তিকেই প্রকৃত 'প্রেম' নামে অভিহিত করেছেন—প্রহ্লাদকেই

তিনি পরম ভক্তের দৃষ্টান্ত বলে স্বীকার করেছেন। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। 'আনন্দমঠে' সন্তান সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দ বলেছেন—'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়, সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর 'প্রেমধর্ম'-গ্রন্থে এই সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' ধর্ম সম্পর্কে বিশদ, ধারাবাহিক কোনো আলোচনা নেই। তবে, তাঁর অন্যান্য রচনায় ধর্ম সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলে গেছেন, এখানে সেইসব উক্তিরই সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিত্তশুদ্ধি'-প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি'; ধর্ম এবং সাহিত্য'-প্রবন্ধে বলেছেন, 'সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেন না সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম।·· কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র।···সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।'

বাহ্যসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে মানুষের সমাজে দিনে দিনে নানা বিপত্তি যে পুঞ্জিত হয়ে উঠছে—একদিকে হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা—অন্যদিকে বিবেকের শান্ত সংযমের শাসন,—এই দু'য়ের সংঘাতে মানুষ যে ক্রমশঃ বিহ্বল হয়ে পড়ছে,—মানুষের এ দুর্ভাগ্য তাঁর চিন্তার প্রেরণা দিয়েছিল। অনেক লেখায় তিনি এসব কথার বিশ্লেষণ করে গেছেন। তিনি এসব দ্বন্দ্বের যাচাই করেছেন ভগবদ্‌গীতার কষ্টিপাথরে। রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ্ যেমন ছিল সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের কষ্টিপাথর,—বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি শ্রদ্ধা করতেন গীতার আদর্শকে। বিবিধ প্রবন্ধের 'মনুষ্যত্ব কি'-প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।' তাঁর স্বাজাত্যবোধ, সাহিত্য-প্রীতি, বঙ্গদেশানুরাগ,—সবই এই একটি কেন্দ্রীয় আদর্শের ধ্যানে আশ্রিত। 'ভালবাসার অত্যাচার'-প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কার-নীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র'।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুই খণ্ডের বিষয়-সূচী থেকে বিষয় অনুসারে লেখাগুলির নিম্নপ্রদর্শিত বিভাগ চলতে পারে :—সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি,

দর্শন, শিল্প, সংগীত, সমাজ ও আচার,—এবং 'ঐতিহাসিকের চোখে বাংলা'। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক জাতীয় চেতনার সঙ্গে কতো ঘনিষ্ঠ ভাবেই যে জড়িত ছিলেন, তা তাঁর অন্যান্য রচনাবলী না দেখেও শুধু এই 'বিবিধ প্রবন্ধে'র লেখাগুলি থেকেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, মোহিতলাল মজুমদার, বিমলচন্দ্র সিংহ, রেজাউল করীম ইত্যাদি লেখকদের গ্রন্থভুক্ত এবং ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নানা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন মতবাদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান আছে। এখানে সে-বিষয়ে অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি পরিহার্য্য।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগে 'উত্তরচরিত', গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'দ্রৌপদী', 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা',—এবং দ্বিতীয় ভাগে—'ধর্ম এবং সাহিত্য', 'বাঙ্গালা নব্য লেখকদিগের প্রতি', বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা,' এবং 'বাঙ্গালা ভাষা'—সর্বসমেত এই দশটি প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যতত্ত্বের উদ্‌ঘাটনই যে এই প্রবন্ধগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, তা নয়,—প্রথম ভাগে, সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনা সম্পর্কে লেখক তাঁর মন্তব্য দিতে বসে প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে, 'বঙ্গদর্শন'-এর উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে অনুরূপ ভাবে আরও কয়েকটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিতে ভাষার কথাই মুখ্য,—কিন্তু 'বাঙ্গালা নব্য লেখকদিগের প্রতি' এই শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটি হলো প্রধানতঃ সাহিত্যের আদর্শসম্পর্কিত ঘোষণা। এই প্রবন্ধটি ১১৯১-এর মাঘ মাসের 'প্রচারে' প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মোট বারো দফায় বিন্যস্ত এই নির্দেশবাণী বাংলা সাহিত্যের আদর্শ-সম্পর্কিত যাবতীয় manifesto বা ঘোষণাপত্রের মধ্যে আদিতম। তাঁর পূর্ববর্তী রঙ্গলালের বাংলা কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৫৯) যেমন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক সোপান রূপে গ্রাহ্য,—আলোচ্য রচনাটি সেইরকম এক ঐতিহাসিক সামগ্রী। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,—'যশের জন্য লিখিবেন না'। 'টাকার জন্য লিখিবেন না'। পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না'। ষষ্ঠ ধারায় সাহিত্যস্রষ্টাকে আত্মসচেতন হবার পরামর্শ

দিয়ে অনধিকার চর্চা যে তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ, সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ধারায় বলা হয়েছে যে, পাণ্ডিত্য জাহির করবার চেষ্টায়, অলঙ্কার ব্যবহারের আতিশয্যে, এবং রসিকতা প্রদর্শনের অতি উৎসাহের ফলে সৃষ্টির মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক,—অতএব, সাধু সাবধান! অশক্তের অনুকরণস্পৃহা তিরস্কৃত হয়েছে একাদশ ধারায়,—এবং দ্বাদশ অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র কার্যকারণের সংগতি সম্পর্কে নব্য লেখকদের সতর্ক থাকবার উপদেশ দিয়েছেন। দশটি ধারার মূল কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হলো। বাকি রইলো দুটি অনুচ্ছেদ—তৃতীয় ও চতুর্থ উপদেশ। সেই দু'টির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট সাহিত্য-বিশ্বাসটি ধ্বনিত হয়েছে। নিচে যথাযথভাবে সেই দুটি অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হলো :

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ।

এই দুটি ধারায় তিনি যা বলেছেন তাতে সমাজ সম্পর্কে তাঁর চেতনার অনিবার্য, সর্বদা-স্বীকৃত দায়িত্ববোধের যোগটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অথবা পূর্ববর্তী শক্তিমান লেখকসম্প্রদায় যে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন তা নয়,—ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলিতে, হেমচন্দ্রের সদৃশ রচনাবলীর মধ্যে, প্যারিচাঁদ মিত্রের এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক রেখাচিত্রে অথবা প্রবন্ধমালায় সমাজের কথা ফুটে উঠেছিলো বটে,—কিন্তু এসব কথা এর পূর্বে এমন স্পষ্ট করে আর কখনো বলা হয়নি। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাল্যকালের সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকেই এই আদর্শের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর পঠনবৈচিত্র্য সুবিদিত। কোন্

কোন্ সূত্রে তিনি এই প্রেরণা আত্মসাৎ করেছিলেন, সে আবিষ্কার বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। কেবল সাহিত্যের লক্ষ্য সম্পর্কে আর্ণল্ডের ধারণার সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের সাদৃশ্যটুকু এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণীয়। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

Matthew Arnold discussed and defined more clearly than any other writer before him the relation of the critic of literature to the society in which he lives. That is the subject of Culture and Anarchy, and of some of the Essays in Criticism. Here lies his distinctive contribution to the study of critical principles.*

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। সমাজের স্থূল জৈব প্রকৃতির চৌহদ্দির মধ্যে দুজনের একজনও আবদ্ধ থাকেননি। আর্ণল্ড চেয়েছিলেন perfection ;—বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন 'কল্যাণ'। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,—সর্বস্তরেই এই কল্যাণ-বোধ সম পরিমাণে সংলগ্ন। তাঁর উপন্যাসের ক্রম-পরিণতির মধ্যেও এই কল্যাণ-বোধের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যদুনাথ সরকার এই কল্যাণ-বোধের নাম দিয়েছেন 'ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী ভাবধারা'।† ম্যাথ্যু আর্ণল্ডও তাঁর ধর্ম, সাহিত্য ও অনুশীলন সম্পর্কিত রচনাবলীর অনেক জায়গায় এই 'কল্যাণবোধ' বা perfection-তত্ত্বের প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ ছুঁয়ে গেছেন।

* The Making of Literature-R. A. Scott-James.

† বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ-'বঙ্কিম প্রতিভা' দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'Tagore—A Study' (১৯৪৩) বইটি তারিফ করবার মতো রচনা। তিনি অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথের বিপুল সামর্থ্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন,—অবশ্যস্মরণীয় তথ্যগুলি দ্রুত পরম্পরায় উল্লেখ করেছেন,—সর্বোপরি, রবীন্দ্র-মানস-প্রকৃতির মূল প্রবণতাটি বেছে নিয়ে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে অখণ্ড একটি কাব্যের অন্তরঙ্গ উৎস ও উপাদান হিসেবে বিভিন্ন ছেদ-যতি সংবলিত রবীন্দ্র-জীবনের ঐক্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী' (১ম খণ্ড-১৩৪০; ২য় খণ্ড-১৩৪৩), 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র বিশেষ রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায় (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) প্রকাশিত শ্রী অমল হোম রচিত রবীন্দ্র-জীবনী, এবং ইংরেজি 'বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকী'র রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সংখ্যায় (১৯৪১) প্রকাশিত প্রভাতবাবুর লেখা রবীন্দ্র-জীবনীর ক্ষুদ্রতর একটি খসড়া—প্রধানতঃ এই লেখা কয়টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথার অনেকটা সামগ্রিক এবং প্রামাণ্য উপাদান আছে।

Golden Book of Tagore-এ ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রপ্রশস্তিমালা।

'সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী'র 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' পুস্তিকা সম্পাদনা করেছেন বহুগবেষণাসিদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের একটি পঞ্জী' প্রকাশ করেছিলেন। এই ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে যে কাজের সূচনা ঘটেছিলো, ব্রজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ও সজনীকান্তের ভূমিকা-সংবলিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'-এ দেখা গেলো তারই পরিণতি। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের 'রবীন্দ্র-পরিচয়' সম্পর্কিত প্রবন্ধমালা প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রায় সমকালীন রচনা। এ ছাড়া অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শচীন সেন, মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ, অব্দুল ওদুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রমথনাথ বিশী, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, সরসীলাল সরকার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রবাসজীবন চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত,

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি লেখকরা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'কবিপরিচিতি' ও 'জয়ন্তী উৎসর্গ' (পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্র-প্রসঙ্গমালার সুচারু দু'টি সংকলন। রানী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৯), মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৩), প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ, (১৩৪৯),— রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সার্থক আলেখ্যমালা। রবীন্দ্রজীবনের বিচিত্র তথ্যমালার বিচিত্র বিন্যাসের আয়োজনে কেবল যে কবির স্বদেশবাসীরাই উদ্যোগী হয়েছেন, তা নয়। Thompson, Lesney, Aronson, Marjorie Sykes প্রমুখ বহু বিদেশী লেখকও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নানা কণ্ঠের ভাষণে, নানা লেখনীর সঞ্চালনে, নানা তর্কের মুখরতায় এই অনুষ্ঠানের সমারোহ যখন বেশ জমে উঠেছে তখন ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন,

No sense of destiny hangs over Tagore's life ; and therefore, Tagore's life-history is mainly the biography of ideas and artistic creations just as his own dramas are more idylls of the quest than stories of human conflict In other words, Tagore's crises are all subjective, begotten by the spirit, even if nursed by the objective situation. That jealous guard over his soul completely defeats western biographers and baffles any Indian writer of this century who has accepted their model. In another language, the life of Tagore cannot be composed on the symphonic pattern of Goethe's whose variety of creative work most resembled his. Tagore's life-pattern was essentially melodic, with numerous improvisations indeed, but it was built round the regiant notes. This does not at all mean that he did not share in the tragedies of his country and the world. That he did, but his reactions remained essentially personal, spiritual.

ধূর্জটিপ্রসাদ স্পষ্ট ভাষায় এখানে যে কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী সম্পর্কিত রচনাগুলির প্রথমটিতে (জীবনস্মৃতি ১৩১৯ ইং ১৯১২) সেই কথাই বলেছেন ইশারায়। তাঁর অন্তর্লোকে উপকরণের বৈচিত্র্য ম্লান হয়ে গেছে ;—সেখানে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে নিরবচ্ছিন্ন একটি অখণ্ডতার ধ্যান। 'জীবনস্মৃতি'র প্রারম্ভিক নিবন্ধটিতে তিনি লিখেছিলেন :

মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।

জীবনের দৃশ্য ক্ষেত্রের সম্পর্কে কোনোদিনই তাঁর বিরাগ ছিলো না বটে,—কিন্তু দৃশ্যকে তিনি অদৃশ্যের প্রতীক হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর জীবনে তথ্যের সমারোহের তুলনায় সত্যের অভিসার হয়েছে বেশি উপভোগ্য, খণ্ডদৃশ্যের উত্তেজনার চেয়ে সুদূরের প্রসন্ন উপসংহারটি হয়েছে বেশি কাম্য। তিনি বলেছেন, সৃষ্টিতে 'বস্তুরূপী তথ্য' ছাপিয়ে আছে 'সমগ্রতার ঐক্য'। 'তথ্যের পাত্র আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ' নেওয়াতেই তাঁর ছিলো চিরন্তন আগ্রহ। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের কথা :

আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুই মুখো পদার্থ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর একটা দিকে হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে আছে সেই হচ্চে সত্য।—'তথ্য ও সত্য'

অন্যত্র তিনি বলেছেন,—

ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবনের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন। —'সাহিত্য তত্ত্ব'

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে 'তথ্য'-জ্ঞান ও 'বাস্তব' চেতনা সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিশেষত্ব বোঝা যায়।* 'তথ্য'কে সত্যের অধীনস্থ করে 'বাস্তব'কে বিশ্ব ও ব্যক্তির যোগানন্দরূপে দেখবার এই বিশেষ আগ্রহের শাসনেই তাঁর জীবন এবং 'জীবনস্মৃতি'-র শিল্পপ্রকরণ (treatment) দুইই শাসিত;—তাঁর জীবনী সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনার ধ্রুবতারা রূপে এই সত্যটিকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। ধূর্জটিপ্রসাদের উদ্ধৃত মন্তব্যে এই সিদ্ধান্তেরই সংকেত আছে,—তিনি subjective, personal, spiritual ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে, রবীন্দ্রজীবনীর পাঠকের দৃষ্টি বিশেষ একটি দিকে আকর্ষণ করেছেন। 'জীবন-স্মৃতি'র প্রারম্ভিক নিবন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বইটির সম্পর্কে যখন বলেছেন, 'এই স্মৃতি-চিত্রগুলিও···সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে।'—তখন তাঁরও মনে এই একই আগ্রহ বিদ্যমান ছিলো। ঘটনার বা বিষয়ের বৈচিত্র্যের তুলনায় অনুভূতির গভীরতাই যে 'জীবন স্মৃতি'-র অধিকস্বীকৃত, শ্রেয়তর উপাদান,—হ্রস্ব-দীর্ঘ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সম্ভব-অসম্ভব বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তালিকার চেয়ে বিস্ময়ে-আনন্দে-বেদনায় স্পন্দ্যমান বিশেষ কয়েকটি মানসোপলব্ধির উল্লেখের দ্বারাই যে কবিজীবনীর আন্তরিকতর,

* এই গ্রন্থের 'আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতা' দ্রষ্টব্য।

সার্থকতর অভিব্যক্তি সম্ভব,—সাংবাদিকের তথ্যাগ্রহের চেয়ে সাহিত্যিকের সত্যাগ্রহই যে এক্ষেত্রে বেশি গ্রাহ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেকথা লিখে গেছেন।

কিন্তু জীবনী-সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য আদর্শ যে এই লক্ষ্যের বিরোধী,—সেকথা মনে করাও বাতুলতা। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন বটে,—বর্তমান শতকের কোনো ভারতীয় লেখক পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রবীন্দ্র-জীবনী রচনায় উদ্যত হলে বিফলতা অর্জন করবেন। কিন্তু কেন ? কারণ, তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথের জীবনের রূপকল্প গ্যয়টে-র মতো symphonic নয়—melodic। 'সিম্ফনি'র বৈশিষ্ট্য হলো স্বরবৈচিত্র্য—'মেলডি'র লক্ষ্য স্বরৈক্য। রবীন্দ্রনাথ গানে লিখেছেন, 'এক মনে তোর একতারাতে একটি যে স্বর সেইটি বাজা'। 'জীবনস্মৃতি'র আলাপে-ঝংকারে-মীড়ে-মূর্চ্ছনায় একটি কথাই ফিরে ফিরে ধরা দিয়েছে—তাঁর সারা জীবনের সকল ঘটনায় সেই একটি বাণীর একক ব্যঞ্জনাই যেন একমাত্র লক্ষ্য। সেই 'একটি কথা' কোন্ কথা ? সে হলো রবীন্দ্রনাথের কবিত্বমুখ্যতা। 'আত্মপরিচয়'-এ (১৩৫০) সংগ্রথিত প্রবন্ধগুলির প্রথমটিতে ('বঙ্গ ভাষার লেখক'-গ্রন্থে ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রথম মুদ্রিত) এই কথাটিই অন্য ভাবে স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন :

> এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।

'আত্মপরিচয়ে'র শেষ প্রবন্ধে (১ বৈশাখ ১৩৪৭) তিনি আবার লিখেছেন :

> নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারিদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখেন নি। তাঁর তিনখানি বাংলা বইয়ে—'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' (১৩৪৭) ও 'আত্মপরিচয়'-এ—এবং তাঁর ইতস্তত: সংরক্ষিত বা গ্রন্থভুক্ত অসংখ্য চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর জীবনের নানা পর্বের ছবি সঞ্চিত আছে। 'জীবনস্মৃতি'র পরিধির মধ্যে বাঁধা পড়েছে তাঁর শিক্ষারম্ভের প্রত্যূষকাল থেকে 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)-এর লগ্ন অবধি—তাঁর প্রথম বছর কুড়ি-র আত্মকথা।

'ছেলেবেলা' লিখতে বসে পরিণত বয়সের খ্যাতি-প্রতিপত্তির শিখর থেকে

তাঁকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে হয়েছে 'অতীতের প্রেতলোকে'—সেই দূর বিগত কালের অভিমুখে, যে-কালে 'বুদ্ধির এলাকায়···বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো।' 'এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌছিয়েছে।'

'ছেলেবেলা'র বিষয়-পরিধির বর্ণনসূত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্রদত্ত এই মন্তব্যটির সঙ্গে-সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'-র সঙ্গে এই বইখানির আংশিক তুলনা সম্পর্কে তাঁর অন্য প্রচেষ্টাটিও স্মরণীয়। 'ছেলেবেলা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। সে হোলো কাহিনী, এ হোলো কাকলী, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।

'ছেলেবেলা'র এবং জীবনস্মৃতি'-র বিষয়-পরিধির পৃথক দুই বেষ্টনী যদিও পরস্পর-সংস্পর্শী, তথাপি, এই দুই রচনার মর্জিতে দেখা যায় সুস্পষ্ট এক বিভেদ। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটি সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়ে 'ছড়ার ছবি'-র (আশ্বিন ১৩৪৪, ইং ১৯৩৭) সঙ্গে 'ছেলেবেলার মর্জিগত ঐক্যের স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন :

তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেক-টাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।

'আত্মপরিচয়' সর্বসমেত ছ'টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩১১-য়; দ্বিতীয়টি ২০-এ মাঘ, ১৩১৮-তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে প্রথম পঠিত হয়ে ১৩১৮-র ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়; তৃতীয়টি ১৩২৪-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার 'সবুজ পত্রে' এবং চতুর্থটি ১৩৩৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়;—পঞ্চমটি ১৩৩৮-এর ১৫-ই পৌষ সেনেট হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব-বাসরে পঠিত হয়; এবং ষষ্ঠ প্রবন্ধটি ১৩৪৭-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'জন্মদিনে' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়া 'আত্মপরিচয়ে'র পরিশিষ্ট অংশে 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীর অনুরোধে লেখা রবীন্দ্র-নাথের ১৩১৭ সালের একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে। সেই চিঠিখানিতে কবি অতি সংক্ষেপে তাঁর জন্মকাল থেকে ২৮শে ভাদ্র, ১৩১৭ অবধি জীবনযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন। 'আত্মপরিচয়'-এ ১৩১১ থেকে ১৩৪৭

পর্যন্ত কবির প্রায় ছত্রিশ বছরের নানা লগ্নের আত্মোপলব্ধি সংকলিত হয়েছে।

'জীবনস্মৃতি' 'আত্মপরিচয়', আত্মকথা, আত্মজীবনী—যে-নামেই এদের ডাকা যাক না কেন, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে লেখা কোনো বিখ্যাত autobiography-র সঙ্গেই 'জীবনস্মৃতি'র নিখুঁৎ সাদৃশ্য নেই। তার হেতু হলো রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখিতা,—তাঁর সংশয়হীন আত্মস্থতা।

'জীবনী এবং 'আত্মজীবনী'র মধ্যে রূপকল্প ও প্রকরণের কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। একজনের 'জীবনী' অন্যজনে লেখেন, কিন্তু আত্মজীবনী'-র লেখক নিজেই নিজের জীবনীকার। ফলে, 'জীবনী' যে-পরিমাণে তন্ময় (objective) হতে পারে, 'আত্মজীবনী' সে পরিমাণে নয়। আবার 'জীবনী'-লেখক তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য জীবন-কাহিনীর বর্ণনায় প্রশংসায় যেমন প্রগল্ভ হতে পারেন, নিন্দায় তেমনি পঞ্চমুখ হতেও বাধা নেই। তবে যাঁর নিন্দায় অথবা প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হতে চান, তাঁর সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত জনমত অথবা প্রামাণ্য তথ্যাবলীর বিরুদ্ধে গেলে তাঁর আদর হয় না। শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা লিখতে বসে বৃন্দাবন দাস থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথায় মগ্ন হয়ে গেছেন। মহাপ্রভু যে রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন—চৈতন্যজীবনীর মধ্য ও অন্ত্য পর্বের রূপায়নে লেখকরা তাঁদের পাঠকদের সেই কথাটিই ভুলিয়ে দেবার যৌথসাধনায় নেমে পুণ্য অর্জন করে ক্ষান্ত হয়েছেন। বৃন্দাবন দাসের 'আদিলীলা'য় অথবা জয়ানন্দের লেখায় এই মনোভাবের ব্যতিক্রম আছে বটে,—কিন্তু সামগ্রিকভাবে, মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন লেখকের মনোভাবের ঐক্যই দেখা যায়—তাঁরা সবাই ভক্তিরসে আপ্লুত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যদি নিজের জীবনী নিজে লিখতেন তাহলে নিজের মহিমা সর্ব্বস্বীকৃত সত্য হলেও তাঁকে আত্মপ্রশংসার অতিরেক সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকতে হতো। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১৪-র মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' বর্তমান 'আত্মপরিচয়ে' সংকলিত প্রথম প্রবন্ধটি পড়ে 'দম্ভ ও অহমিকা'-র অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। সেই অভিয়োগের জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যায়টের কোনো রচনায় ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম ; যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে-শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক লেখার বিরুদ্ধে সমালোচকের অভিযোগ দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। একদল বলেছেন, 'জীবনস্মৃতি'তে কবির পরিপূর্ণ অন্মোদ্‌ঘাটন নেই—রুশোর Confessions-এর পূর্ণতা নেই ওখানে। এ-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার অনাবশ্যক,—কারণ, রুশোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের পার্থক্য এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য যদি অসত্য না হয়, তাহলে দু'জনের 'আত্মজীবনী' এক ছাঁচে গড়া হবে, এ কেমন কথা? তবে, রুশোর আত্মজীবনী যেমন বহু দুঃখভোগী, বিপ্লবী রুশোর ব্যক্তিত্বে সুবিশিষ্ট, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি তেমনি রবীন্দ্রনাথের উদাস, ব্যাকুল, কবিত্বমুখ্য ব্যক্তিত্বের সুরে বিশিষ্ট। ষোড়শ শতকের ফ্লোরেন্সের স্বর্ণকার সেলিনি (Benvenuto Cellini 1500-71), বিশ শতকের নৃত্য-পটিয়সী ইসাডোরা ডানকান,—এবং ভারতের অমর জননায়ক মহাত্মা গান্ধী—এঁরা তিন জনে তিন মার্গের সাধক,—তিনজনে তিনখানি জগদ্বিখ্যাত আত্মজীবনী লিখে গেছেন। বলা বাহুল্য, তিনটি এক ছাঁচে গড়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিও তেমনি পৃথক ছাঁচের সামগ্রী। তাদের সার্থকতা তাদের উদ্দেশ্যের চরিতার্থতায়, অন্য লেখকের কিংবা অনেক লেখকের অনুসৃত পথের অনুসারিতায় নয়। তবে, স্বদেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনীগুলির স্বাতন্ত্র্য যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যদিকে পৃথক আদর্শে লেখা আধুনিক জীবনী ও আত্মজীবনীর ভঙ্গি ও কলাকৌশলও তেমনি আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে। উনিশ শতকে সাহিত্যিক কৌলীন্যে বাংলা গদ্যের যখন উন্নয়ন ঘটলো, তখন থেকেই একটি একটি করে জীবনী ও আত্মজীবনী দেখা দিয়েছে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং রাজীব-লোচন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের জীবনীর দৃষ্টান্ত। শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন,

With the dawn of the nineteenth century we find two notable attempts at biographical literature, Krishnachandra-charit and Pratapaditya-charit, which were made under the auspices of the College of Fort william... It is significant that both the heroes were lay and historical figures .

Krishnachandra-charit survived the general ruin or obloquy which over took so many of the books written at this stage, †

তারপর ক্রমশঃ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী-দের জীবনী লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা লেখার সময়ে গুপ্তকবির জীবনীর খসড়া লিখেছেন। কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবনবেদ' (১৮৮৪), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জীবনবৃত্তমালা, নবীন সেনের পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'আমার জীবন', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৩২৫)—প্রভৃতি গ্রন্থ-নাম এই সূত্রে স্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী-'র প্রথম সংস্করণ শতাব্দীর শেষে ১৮৯৮-এ প্রথম ছাপা হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়ারি', বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বই জীবনী নয়—কিন্তু কতকটা সমধর্মী রচনা। একেবারে আধুনিক কালের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-ও জীবনী-শ্রেণীর সাহিত্য। এ সমস্ত রচনাই প্রধানতঃ তথ্যনিষ্ঠ,—ঘটনাতালিকাপ্রণয়নব্রতী। কিন্তু আধুনিক জীবনীর আদর্শ অন্যরকম। আধুনিক জীবনীকার লিটন স্ট্রেচি বলেছেন :

To preserve a becoming brevity—a brevity which excludes everything that is redundant and nothing that is significant—that surely is the first duty of the biographer. The second no less surely, is to maintain his own freedom of spirit, It is not his business to be complimentary ; it is his business to lay bare the facts of the case as he understands them. *

লিটন স্ট্রেচির (১৮৮০-১৯৩২) কৌশলের তারিফ ক'রে বিখ্যাত চৈনিক সাহিত্যিক লিন্-য়ু-টাঙ্ বলেছেন :

...The very charm of biography, its very readability depends on showing the human side of a great character which is so similar to ours, Every touch of irrational behaviour in a biography is a stroke in convincing reality, On that alone Lytton Strachey's success depends. §

দীপবাহিকা (Lady of the lamp) ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ছবি আঁকতে বসে লিটন স্ট্রেচি তাঁর রোষপ্রতিমা-সত্তার (Angel of wrath) কথা বিস্মৃত হননি। ম্যানিং, নিউম্যান, গ্ল্যাডষ্টোন, জেনারেল গর্ডন—

---

† Western influence in Bengali Literature

* Preface to Eminent Victorians—Lytton Strachey

§ The Importance of Living : Lin yu tang.

বর্ণনীয় চরিত্রটি যাঁরই হোক না কেন, স্ট্রেচি তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ করেই গড়েছেন। মহত্তের মহত্ত্ব ফুটেছে তাঁর লেখায়—কিন্তু দুর্বল মানুষের দৌর্বল্য গোপন করবার গোঁড়ামি তিনি পরিহার করেছেন। প্রয়োজন-মতো ব্যঙ্গরসের মৃতসঞ্জীবনী ছিটিয়ে মরা মানুষকে তিনি বাঁচিয়ে তুলেছেন অভিনব কৌশলে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি 'আত্মজীবনী' বলেই ভিন্নধর্ম্মী। তাতে এই সব লেখার তন্ময়তা (objectivity) নেই—আছে মন্ময়তা (subjectivity)। লিটন স্ট্রেচি, আঁদ্রে মোরোয়া, ডেভিড্ সেসিল প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক জীবনীকারের আধুনিক কলাকৌশলের ধার দিয়েও তিনি হাঁটেন নি। বিশ শতকের অন্যতম খ্যাতনামা আত্মজীবনীকার এডমণ্ড গসের (১৮৪৯-১৯২৮) 'Father' and Son' (১৯০৭)-এর অপ্রিয়-সত্যপরায়ণতাও তাঁর আদর্শ নয়।

আত্মজীবনীর প্রধানতম গুণ—ঘনিষ্ঠ আলাপের ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' এবং 'ছেলেবেলা'য় সেগুণ যতোটা ফুটেছে, 'আত্মপরিচয়ে' ততো নয়। প্রথম দু'খানি বইয়ে কবিত্বমুখ্য, জ্যোতির্ময় রবীন্দ্রমানসের রূপায়নই যদিচ আশুলক্ষ্য,—তথাপি তাঁর রক্তমাংসের ছায়াটি একেবারে বাদ পড়েনি—বালক, কিশোর, যুবক রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোর-যৌবনাবস্থার বিশেষ বিশেষ মনন এবং আচরণ—দুইই ফুটেছে। কিন্তু 'আত্মপরিচয' অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। এ বইয়ে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মহাসমুদ্র থেকে কতকগুলি শ্রদ্ধেয় উপলব্ধির সূত্র ও টীকাটিপ্পনী একই সঙ্গে উদ্ধার করছেন। প্রকৃতি তাঁকে কি দিয়েছে,—জীবনদেবতা তাঁর কতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—মৃত্যু অথবা প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি রকম,—এই সব গম্ভীর আলোচনায় 'আত্মপরিচয়'-এর লেখক অতি মনোযোগী। মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চের বাইরে সরিয়ে দিয়ে সূক্ষ্মদেহী কবি এখানে পণ্ডিতের কাছে আপন অস্তিত্বের জবাবদিহি করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' অথবা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' যেমন ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে লেখা,—'আত্মপরিচয়' তেমন নয়। চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা' অথবা প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'র মতো প্রতিবেশীসচেতনতাও ও-বইয়ে নেই। ও-বইয়ে আছে সতর্ক বিনয়, সুশৃঙ্খল শোভনতা, পূর্ণ কবিখ্যাতির দায়িত্ববোধ। নিজের

পুরানো চিঠি, কবিতা, নাটক থেকে অংশ তুলে-তুলে আত্মজীবনের ক্ষীণ সূত্রোয় তিনি যা গেঁথে তুলেছেন তাকে বলা যায়—আত্মমাহাত্ম্য-স্মৃতির মণিহার। সে হারের দীপ্তিতে আছে ঐশ্বর্যের অনিবার্য দূরত্ব,—তার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে অতৃপ্তিকর দুর্মূল্যতাবোধ—অতি শুচি, অতি দূরবর্তী এক কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে দৃষ্টিকোণ থেকে 'আত্মপরিচয়-' এর প্রথম প্রবন্ধটি লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে এই প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। ধূর্জটিপ্রসাদ এতোদিনে রবীন্দ্রজীবনী আলোচনার যথোচিত দৃষ্টিকোণটির নির্দেশ দিয়েছেন।—তাঁর জীবনী মানে তাঁর ধ্যানের বিবর্তন,—তাঁর শিল্প-সৃষ্টির পারম্পর্য—তাঁর নাটকে যেমন মানবসংসারের ঐহিক সংঘাতের বদলে চিরসত্যের সন্ধিৎসাই মুখ্যবস্তু,—তাঁর জীবনেও তেমনি খণ্ডের চেয়ে সমগ্রতার আগ্রহ বেশি ফুটেছে—বিচিত্র বাসনা ও অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছে অচঞ্চল, আত্মস্থ, চিরশান্ত এক কবিপ্রাণ।